মাহাবুবুল হাসান নীরুর

সেরা দশ গল্প

শৈলী প্রকাশনী

'ছোট গল্পের কেন্দ্রীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, যা বলা হয় কিংবা লেখক যা বর্ণনা করেন এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু বর্ণনা করতে ইচ্ছুক-এ দুটো দিককে ছাড়িয়ে এমন একটা কিছু থাকে যা আপাত অপ্রকাশিত এবং রহস্যময়। আসলে এ ব্যাপারটি একটা সংকেত। আর এ সংকেত অনুসরণ করে যে কোনো পাঠক তার কল্পনাকে পরিচালিত করতে পারে। এটা মূলতঃ মানব-জীবনে একটি চিরন্তনেরই সুক্ষ্ম উদ্ভাসন। আমার দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে নীরু বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।'

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

উ ৎ স র্গ

আজহারুল ইসলাম মাখন ও শায়লা পারভিন পান্না,
বহু দূরে অবস্থান করেও যে দুটো হৃদয় আজ আমাকে
যোগায় অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহস.....

জীবনের নদীটাতে আজও টলমলে জল আছে
তরি আছে সেই জলে, মাঝি নেই ধারে-কাছে,
সেই জলে কখনো সোনারোদ যদি নাচে
সে আশায় বুক বেঁধে নদীটা বেঁচে আছে.....

সেরা দশ গল্প

মা হা বু বু ল হা সা ন নী রু

A1 Tutorial
A1 TUTORIAL
892 Jean-Talon West (corner street:Outremont)
Metro: Parc & L'acadie, Bus: 16, 80, 92, 179
Tel: (514) 276 9898, E-mail: a1tutorial@gmail.com

শৈলী
shoily.com

সেরা দশ গল্প

মাহাবুবুল হাসান নীরু

প্র কা শ ক
রিপন কুমার দে
শৈলী প্রকাশনী,
শৈলী.কম
©shoily.com

Media partner
A1 TUTORIAL, Montreal
TAILOR & DRY CLEANERS
HUM,, Montreal

প্র চ্ছ দ
কাওসার মাহমুদ

প্র কা শ কা ল
১৫ নভেম্বর ২০১২

স র্ব স্ব ত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

অ ল ঙ্ক র ণ
শৈলী টীম

Published by Ripon kumar dey, Shoily prokashoni, Waterloo, Canada,
ripon4t@gmail.com

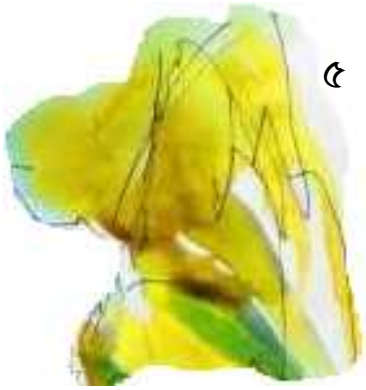

অনলাইন পাঠকদের জন্য শৈলী প্রকাশনীর আর একটি নিবেদন, স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক মাহাবুবুল হাসান নীরুর সেরা দশটি গল্প সমৃদ্ধ এ ই-গ্রন্থ। গল্পগুলো শৈলী প্রকাশনীর নিজস্ব বাছাই। সব ধরণের পাঠকের কথা মাথায় রেখেই গল্পগুলো বাছাই করা হয়েছে। ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন স্বাদের বৈচিত্রপূর্ণ গল্পগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। লেখক এ যাবৎ লিখেছেন দেড় শতাধিক গল্প। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা গল্পগুলো পরবর্তীতে স্থান পেয়েছে তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থে। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'সেরাগল্প', 'গল্পসমগ্র' 'পরবাসে প্রায়শ্চিত্য', 'যুবক এবং যন্ত্রণা', 'গুডনাইট টুনি', 'দুইয়ের ভেতোরে এক' 'সম্প্রীতি'। গল্পগুলো নেয়া হয়েছে সেসব গ্রন্থ থেকেই। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করেছি সেরা গল্পগুলো নিয়ে একটি সেরা মানের ই-গ্রন্থ পাঠকদের উপহার দেয়ার। এ গ্রন্থে পাঠকরা পাবেন আধুনিক প্রযুক্তির অনুপম ছোঁয়া। শৈলী তার গ্রন্থের গুণগত মানের ব্যাপারে সব সময়ই অধিকতর সচেতন। গ্রন্থটি পাঠকদের প্রশংসা কুড়োতে সক্ষম হলে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

রিপন কুমার দে
ওয়াটারলু, কানাডা।

সূ চি প ত্র

অসময়	৮
চলো গ্রামে ফিরে যাই	১৯
অফিস পাড়ার সুন্দরী	৩১
প্রতিপক্ষ আগুন	৪১
হাজারকি	৫০
মেঘগুলো আর পালিয়ে যাবে না	৬০
টিকিট	৭০
আমার বিবির বাহারী শখ	৮২
দলান্তরিত	৯৯
আদমজী নগরের অতশী	১০৯

কাছের মানুষগুলোর ভালোবাসা যখন প্রগাঢ় হয়, তখন আমি অনুপ্রাণীত হই। সে ভালোবাসার বিশ্বাসযোগ্যতা, হাসি ও প্রীতি আমাকে যোগায় শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা। কিন্তু যখন বর্ণিল সময়ে থাবা বসায় বিবর্ণ বাতাস। কোনো দানবের কালো হাত ক্ষত-বিক্ষত করে হৃদয়। বিশ্বাসকে পদদলিত করে কাছের কোনো মানুষ; তখন বড্ড কষ্ট হয়। নষ্ট হয় মন ও সময়। জীবন-নদীটাতে ছড়ায় বেদনার নীল রঙ। বুকের ভেতোরের যন্ত্রণাটা আরো বাড়ে তখনই যখন দেখি দেবতার লেবাসধারি অপদেবতার বাড়াবাড়ি! তারপরও মুখে রঙ মেখে সঙ সেজে বেঁচে থাকতে হয়। যদিও কর্মটি আমার নয়; তথাপি জীবনেরই জয়। জীর্ণ শরীর-মন; কোনো কিছুতেই এ জীবন থেমে থাকবার নয়।

কানাডার শৈলী প্রকাশনী আমার গল্পগুলো থেকে সেরা দশটি গল্প বেছে নিয়ে এ ই-গ্রন্থটি প্রকাশ করছে। একজন লেখকের কাছে তার সব গল্পই ‘সেরা’। এ গল্পগুলো একান্তই শৈলীর নিজস্ব বাছাই। এটাই আমার প্রথম ই-গ্রন্থ। আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে অনেক অনলাইন পাঠকের সাথে আমার লেখার পরিচয় ঘটবে। বিশ্বাস করি, শৈলীর বাছাইকৃত গল্পগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে। আশা করছি অন্ততঃ এই বিশ্বাসে থাবা বসাবে না কোনো বিবর্ণ বাতাস।

মাহাবুবুল হাসান নীরু
মন্ট্রিয়ল, কানাডা।

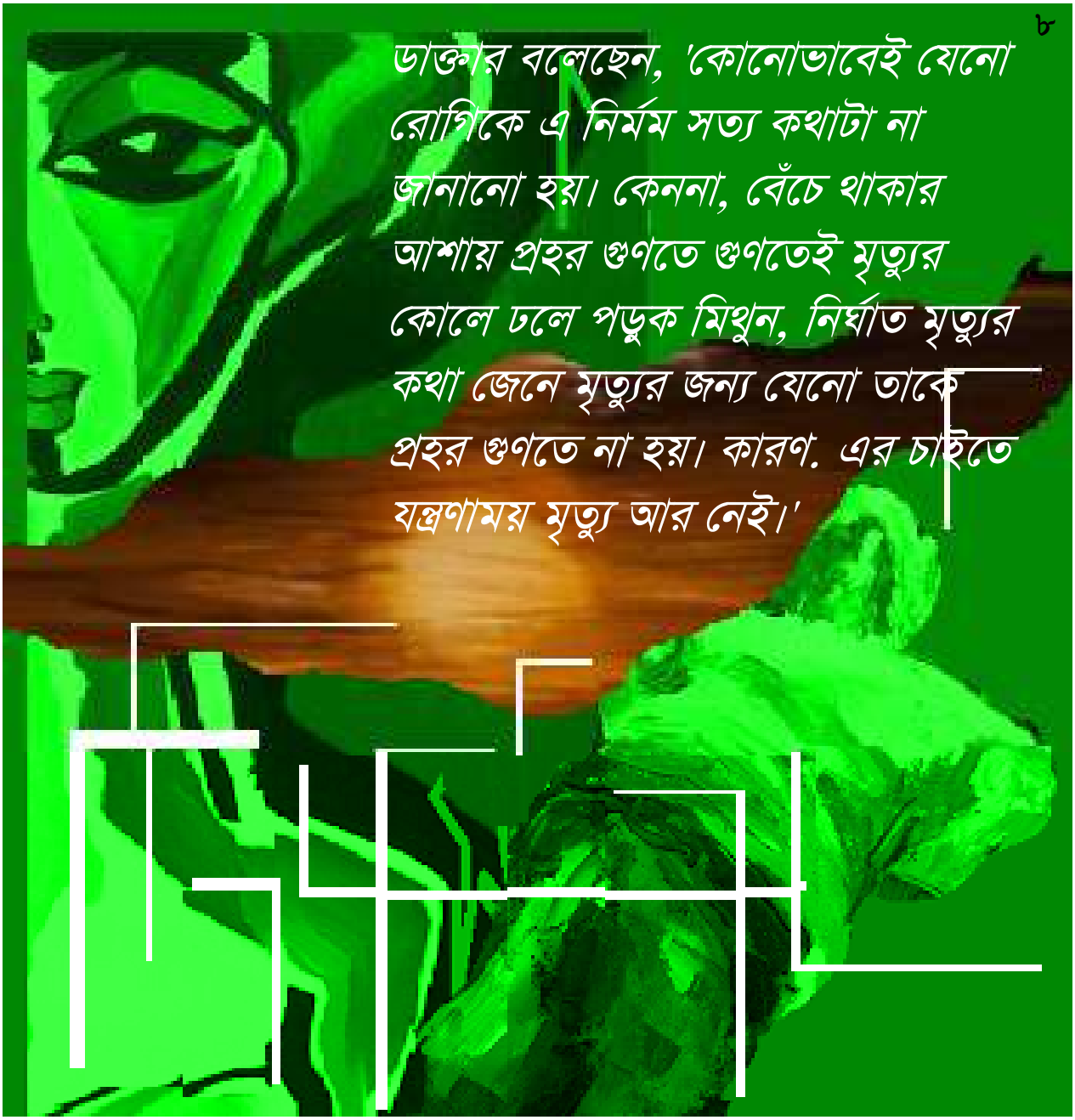

ডাক্তার বলেছেন, 'কোনোভাবেই যেনো রোগিকে এ নির্মম সত্য কথাটা না জানানো হয়। কেননা, বেঁচে থাকার আশায় প্রহর গুণতে গুণতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ুক মিথুন, নির্ঘাত মৃত্যুর কথা জেনে মৃত্যুর জন্য যেনো তাকে প্রহর গুণতে না হয়। কারণ. এর চাইতে যন্ত্রণাময় মৃত্যু আর নেই।'

অসময়

গল্প-এক

মিথুনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের তারিখটা নির্ধারিত হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে আগামী ষোলই এপ্রিল, দিনের যে কোনো সময়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে মিথুন।। কিন্তু এই নির্মম সত্যটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না সিনথিয়া। সে বিশ্বাস করতে পারছে না; এবং বিশ্বাস করতে চায় না যে, তার সবচেয়ে কাছের ও পাশের মানুষটি আর মাত্র তিন দিন পর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। হারিয়ে যাবে অনন্তলোকে। তখন চিৎকার করে ডাকলেও সাড়া মিলবে না মিথুনের; কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেলেও ফিরে আসবে না মিথুন। কী নিষ্ঠুর! কী হৃদয় বিদারক! কলজেটা মোচড় দিয়ে ওঠে সিনথিয়ার। শরীরটা অবশ হয়ে আসে। মাথার ভেতোর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে সে। জলে ভেজা জবা ফুলের মতো লাল টকটকে চোখে তাকিয়ে থাকে অসাড় হয়ে পড়ে থাকা মিথুনের চিমষে যাওয়া মুখটার দিকে। চোখ দুটো কোটরে দেবে গেছে। কালো হয়ে গেছে মুখমন্ডল। ন্যাড়া মাথা। ডাক্তারের পরামর্শে চুলগুলো চেঁছে ফেলা হয়েছে। দেহটা শুকিয়ে একেবারে পাটকাঠি হয়ে গেছে।

সিনথিয়া অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে রোগাক্রান্ত মিথুনের মুখখানার দিকে। ও ভেবে পায় না, কেনো এই জীবন, কেনোই বা মৃত্যু! জীবন-মৃত্যু নিয়ে ওর এ ভাবনাটা আজকের নয়। সেই ছেলেবেলা থেকে। একবার মাকে প্রশ্ন করেছিলো, 'মা, মানুষ কেনো জন্মগ্রহণ করে, আবার কেনোই বা মৃত্যুবরণ করে?

শিক্ষিত স্কুল শিক্ষয়ত্রী মা উত্তরে বলেছেন, 'জানি না রে মা, সবই খোদার লীলা-খেলা।'

'কেনো খোদার এ লীলা-লেলা?' মায়ের উত্তরে পুনরায় প্রশ্ন করেছিলো সিনথিয়া।

মা বলেছেন, 'শুধু আমি কেনো, প্রশ্নটির উত্তর এ নশ্বর পৃথিবীতে কেউ আজও খুঁজে পায়নি।'

দিনে দিনে বড় হয়েছে সিনথিয়া, খুঁজতে চেষ্টা করেছে সে প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু আজও কোনো কুল-কিনারা পায়নি ওর জিজ্ঞাসার। একবার সে প্রশ্নটি করেছিলো মিথুনকে। উত্তরে মিথুন মিটিমিটি হেসে বলেছে, 'দুনিয়াতে মানুষের আসা যাওয়া নিয়ে আমার কোনো কৌতুহল নেই। যেমন একদিন এসেছি, ঠিক তেমনই একদিন চলে যাবো। এ নিয়ে ভাবাভাবির কি আছে? যে ক'টা দিন আছি আনন্দ-ফূর্তি করেই থাকতে চাই।'

বড় দিল খোলা আমুদে লোক ছিলো মিথুন। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিলো ওর দেহ-মন। সারাক্ষণ মুখটাতে হাসি লেগেই থাকতো। কথা বলতো চমৎকার গুছিয়ে। সব মিলিয়ে শক্ত, সমর্থ, সুন্দর মনের পরিপূর্ণ একজন মানুষ ছিলো সে। আর তাইতো প্রথম

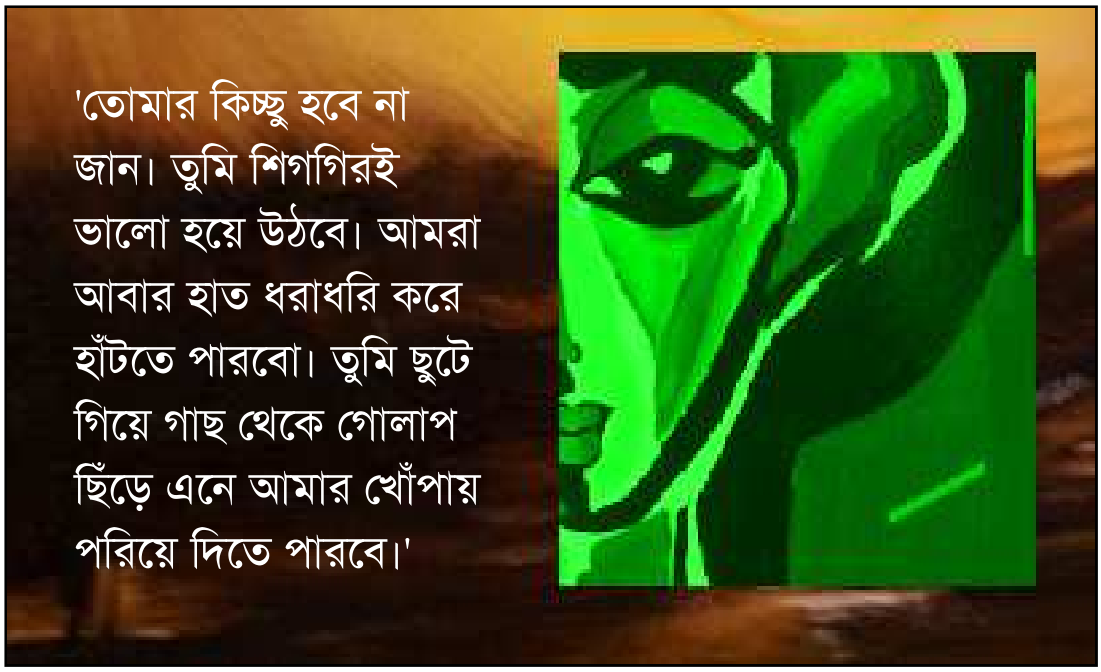

দেখাতেই মানুষটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো সিনথিয়া। মনে পড়ে সোনালি অতীতের সেই ঝলমলে দিনটির কথা, যে দিনটিতে মিথুনের সাথে ওর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আদমজী জুট মিলের জে.ও কলোনির আঁচল খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলো। কলোনিটা বেশ বড়। সত্তুরটি বাসা। একদিন সন্ধ্যায় খালার বাসার ড্রইং রুমে দেখা হলো মিথুনের সঙ্গে। আঁচল খালা ওর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, 'মিথুন খুব ভালো ছেলে। লেখাপড়া শেষ করে এখন চাকরি খুঁজছে।'

মিথুন যে কতো ভালো ছেলে ওর সাথে ক'দিন মেলামেশা করেই বুঝেছিলো সিনথিয়া। ফলশ্রুতিতে পরিচয়ের সংকীর্ণ পথটা প্রণয়ের প্রশস্ত পথে রূপান্তরিত হয়েছিলো মাত্র ক'দিনের ব্যবধানেই।

মিথুন প্রতি সন্ধ্যাতে খালার বাসায় আসতো। ওর সাথে হেসে গল্প করে সময় যে কিভাবে কেটে যেতো সেটা টেরই পেতো না সিনথিয়া। যেদিন খালার বাসায় বেড়ানো শেষে আদমজী ছেড়ে ঢাকায় নিজেদের বাসায় ফিরে এসেছিলো, সেদিন মিথুনের জন্য ও খুব কেঁদেছিলো। মিথুনের চোখও ভরা ছিলো জলে। সিনথিয়ার হাত চেপে ধরে বলেছিলো, 'একটা চাকুরি পেয়ে গেলেই আমরা ঘর বাঁধবো।'

মিথুনের খুঁটির জোর ছিলো না, তাই একটা চাকুরির জন্য ওকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো অনেকদিন। ক্ষয়ে ক্ষয়ে জুতোর সোল যখন নিঃশেষ হয়ে শুকতলায় ঠেকলো ঠিক তখন একটা চাকুরি পেলো সে। যদিও যোগ্যতার যোগ্য পুরস্কার সেটা ছিলো না, কিন্তু স্বপ্নের সোনার হরিণটাকে বাস্তবে ধরে ফেলতে সহায়তা করলো সেটা। চাকুরি পাবার পরের মাসেই মিথুন ওকে বিয়ে করলো। বিয়ের পর নতুন জীবনের সুমিষ্ট স্বাদে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো সিনথিয়ার নারী হৃদয়। মিথুনের সুনিবিড় সান্নিধ্যে যেনো পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো সে। ওর প্রশস্ত বুকটায় যখন মাথা রাখতো তখন মনে হতো এর চাইতে সুখ বুঝি পৃথিবীতে আর কিছুতে নেই। মিথুনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে বুকভরা সুখ অনুভব করতো সিনথিয়া। আবেগাল্পুত কণ্ঠে বলতো, 'মিথুন, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। কথা দাও, আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাবে না।'

মিথুন ওর চিবুক তুলে ধরে বলতো, 'কখনো না। কোনোদিও আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো না সিনথিয়া।' এরপর আবেগভরা কণ্ঠে বলতো, 'বিশ্বাস করো সিনথিয়া, তোমার বিচ্ছেদ বেদনা আমি কোনোদিন সহ্য করতে পারবো না। তাই তো খোদার কাছে সব সময়ই প্রর্থণা করি, তোমার আগে যেনো আমার মরণ হয়।'

সিনথিয়া মিথুনের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলতো, 'ছিঃ, অমন কথা বলে না। খোদা যেনো তোমার আগে আমাকে তুলে নেন।'

আল্লাহ সিনথিয়ার প্রার্থণা শোনেননি, পক্ষান্তরে বোধকরি কবুল করেছেন মিথুনের প্রার্থণা। আর তাই তো আজ সকল বাঁধা ছিন্ন করে, সকল মায়া তুচ্ছ করে সিনথিয়াকে ছেড়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে মিথুন।

মৃত্যু পথযাত্রী মিথুনের শুকিয়ে যাওয়া বুকটার ওপর মাথা রেখে হু হু করে কাঁদতে থাকে সিনথিয়া।

ধীরে ধীরে ক্লান্ত, অবসন্ন চোখ দুটো মেলে তাকায় মিথুন। অতিকষ্টে দুর্বল ডান হাতটা তুলে সে সিনথিয়ার মাথায় রাখে। এরপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে দুর্বল কণ্ঠে বলে, 'তুমি কাঁদছো কেনো সিনথিয়া, ডাক্তার কি বলেছেন, আমি মরে যাবো?' মিথুনের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে ফোটায় ফোটায় অশ্রু। একটা দম নিয়ে কান্নাভরা কণ্ঠে বলে সে, 'না, না সিনথিয়া, আমি মরবো না। তোমাকে ছেড়ে মরতে পারি না।'

মিথুনের কথায় সিনথিয়ার হৃদয় ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়।

মিথুন জানে না আর তিনদিন মাত্র তার আয়ু। ডাক্তার বলেছেন, 'কোনোভাবেই যেনো রোগিকে এ নির্মম সত্য কথাটা না জানানো হয়। কেননা, বেঁচে থাকার আশায় প্রহর গুণতে গুণতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ুক মিথুন, নির্ঘাত মৃত্যুর কথা জেনে মৃত্যুর জন্য যেনো তাকে প্রহর গুণতে না হয়। কারণ. এর চাইতে যন্ত্রণাময় মৃত্যু আর নেই।'

সিনথিয়া সে কথা বলেনি মিথুনকে। বলতেও পারবে না। বরং বার বার ওকে আদর দিয়ে বলেছে, 'তোমার কিচ্ছু হবে না জান। তুমি শিগগিরই ভালো হয়ে উঠবে। আমরা আবার হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারবো। তুমি ছুটে গিয়ে গাছ থেকে গোলাপ ছিঁড়ে এনে আমার খোঁপায় পরিয়ে দিতে পারবে।'

সিনথিয়ার কথা শুনে অশ্রু-জলে ভাসে মিথুনের দু'চোখ।

মিথুনের চাকুরিটা সুবিধের নয়। বেতনও আশানুরূপ নয়। সুবিধের নন মালিক নামের লোকটাও। ধুরন্ধর। রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত। এলাকায় নিজের আধিপত্য অটুট রাখতে প্রয়োজনে ম্যানহোলেও গলা পর্যন্ত ডুবে থাকতে রাজি তিনি। কাপড়ের মিল, জুট মিল ও সিনেমা হলের ব্যবসা তার। প্রতিষ্ঠানগুলো একই এলাকায়। এলাকার নাম উদয়পুর। উদয়পুরে ওর প্রতিষ্ঠানের মালিক আব্দুল হালিম ছাড়া আর যেসব নির্দয় গোছের মানুষ আছে তাদের মধ্যে আফজাল খান অন্যতম। আব্দুল হালিম ও আফজাল খানের মধ্যে শত্রুতা দীর্ঘদিনের। এলাকায় কে কার চাইতে বেশী শক্তিশালী এ পরীক্ষায় প্রায়ই তারা স্ব স্ব জনবলে মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। ধন-সম্পত্তি আফজাল খানেরও কম নেই। তিনিও একটা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অনেক খোঁজাখুজির পর মিথুন আব্দুল হালিমের জুট মিলেই সুপারভাইজারের চাকুরি পেয়েছিলো। চাকুরি পাবার পর মিলের কোয়ার্টার পেলো, এবং সিনথিয়াকে বিয়ে করে এনে সে কোয়ার্টারেই তুললো। এখন সেখানেই আছে তারা।

ধীরে ধীরে ক্লান্ত, অবসন্ন চোখ দুটো মেলে তাকায় মিথুন। অতিকষ্টে দুর্বল ডান হাতটা তুলে সে সিনথিয়ার মাথায় রাখে। এরপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে দুর্বল কণ্ঠে বলে, 'তুমি কাঁদছো কেনো সিনথিয়া, ডাক্তার কি বলেছেন, আমি মরে যাবো?'

মিথুনের কণ্ঠে সিনথিয়ার ভাবনায় ছেদ পড়ে। মিথুন দুর্বল কণ্ঠে বলে, 'আমি ভালো হলে তোমাকে নিয়ে এবার কক্সবাজারে যাবো। বড্ড সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে। জানো সিনথিয়া, সমুদ্র দেখলে মানুষের মন বিশাল হয়।' একটা দম নিয়ে সে বলে, 'আসার পথে সিলেট হয়ে আসবো। সেখানে হজরত শাহজালাল (রঃ) ও হজরত শাহপরাণ (রঃ)-এর মাজার জেয়ারত করবো।'

মিথুনের কথা শুনে সিনথিয়ার বুকের ভেতোরটা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চোখ ভরে ওঠে জলে। ও মিথুনের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'তুমি ভালো হয়ে উঠলে আমরা নিশ্চয় কক্সবাজার ও সিলেটে যাবো।'

নিজের অসুস্থতার গভীরতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে যে মিথুন ভাবে না, তা নয়। কখনো কখনো সে সিনথিয়াকে বলে, 'মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি এ ব্যাধির হাত থেকে আর নিস্কৃতি পাবো না। আচ্ছা সিনথিয়া, আমি মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে, তাই না?'

নিজেকে ধরে রাখতে পারে না সিনথিয়া। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

দুর্বল হাতটা সিনথিয়ার মাথায় রেখে মিথুন বলে, 'মরণকে আমি মোটেও ভয় করি না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথাটা ভাবলেই মনটা শিউড়ে ওঠে। আমি তো তোমাকে ছেড়ে একটি দিনের জন্যও কোথাও যাইনি।'

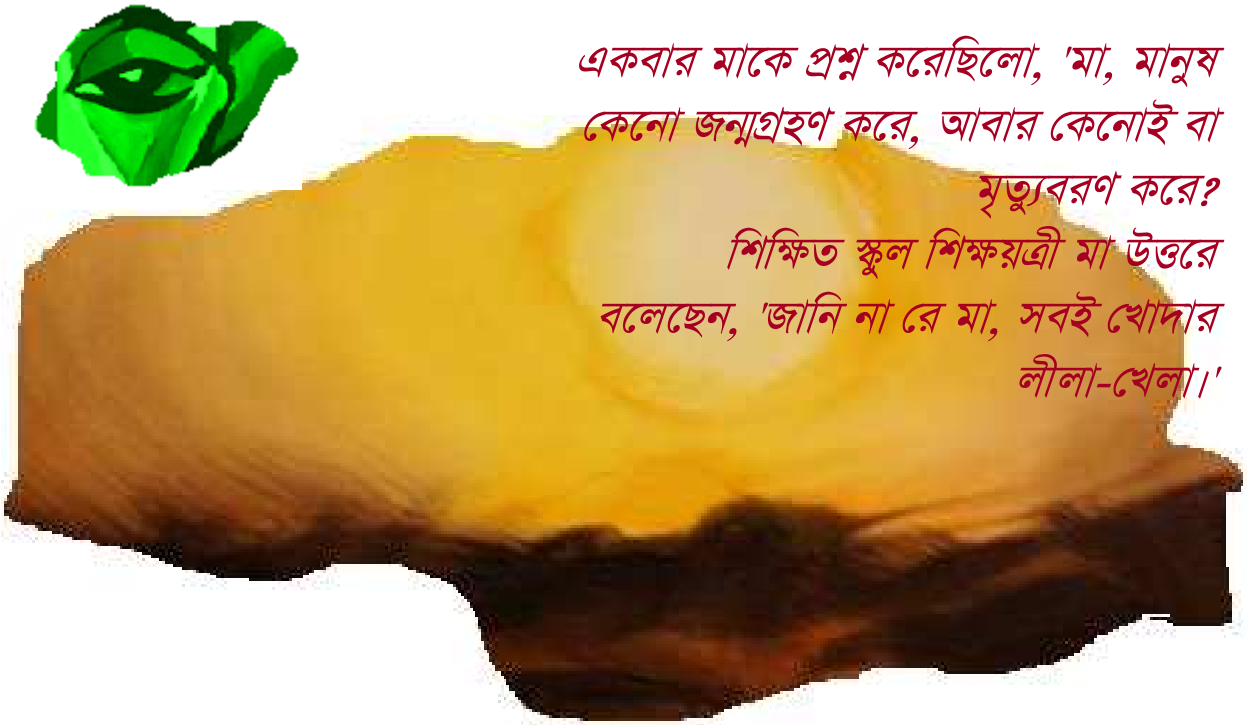

একবার মাকে প্রশ্ন করেছিলো, 'মা, মানুষ কেনো জন্মগ্রহণ করে, আবার কেনোই বা মৃত্যুবরণ করে?
শিক্ষিত স্কুল শিক্ষয়ত্রী মা উত্তরে বলেছেন, 'জানি না রে মা, সবই খোদার লীলা-খেলা।'

মিথুনের মাথাটা বুকে চেপে ধরে সিনথিয়া বলে, 'না মিথুন, আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না।' কথাগুলো বলে মিথুনকে সান্ত্বনা দিলেও সিনথিয়া জানে মিথুন যে রোগে আক্রান্ত তাতে তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা এখনো পৃথিবীতে তৈরী হয়নি। ব্লাড ক্যানসার। মাস খানেক আগে ধরা পড়েছে রোগটা। এরপর থেকে দ্রুত অবনতি, পনরো দিনের মাথায় শয্যাশায়ী; এবং পঁচিশ দিনের মাথায় ডাক্তারের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের তারিখ ঘোষণা।

মিথুন আজও জানে না যে, তার ব্লাড ক্যানসার হয়েছে। কোনোভাবেই কথাটা সিনথিয়া মিথুনকে জানতে দেয়নি।

একটা ভেজা টাওয়াল দিয়ে সিনথিয়া মিথুনের মাথাটা মুছে দিতে দিতে ভাবছিলো অনেক কথা। ফেলে আসা দিনগুলোর কতোই না রঙিন স্মৃতি ওর মনের পর্দায় ভিড় জমাচ্ছে। সেসব স্মৃতি রোমন্থন করছে আর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়াচ্ছে। এ সময় কে যেনো দরজার কড়া নাড়লো।

টাওয়ালটা চেয়ারের মাথায় মেলে দিয়ে দরজাটা খুলে দিলো সিনথিয়া। ঘরে প্রবেশ করলেন মিথুনদের জুট মিলের মালিক আব্দুল হালিম জনা কয়েক সঙ্গীসহ।

আব্দুল হালিম সিনথিয়ার কাছে জানতে চাইলেন, 'কি মা, তোমার স্বামীর শরীরটা কেমন আছে?'

নিচু স্বরে সিনথিয়া উত্তর দিলো, 'অবস্থা খুব একটা ভালো না স্যার।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। ডাক্তার রাজিব আমাকে সব কথাই বলেছে। আর মাত্র তিনটে দিন.....।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আব্দুল হালিম বললেন, 'তাইতো ছেলেটাকে দেখতে এলাম। এমন সৎ ও কর্মঠ ছেলে আমার জুট মিলে দ্বিতীয়টি নেই। তা মা, বাসায় আর কেউ নেই?'

'আছে স্যার। মিথুনের বাবা। উনি একটু বাইরে গেছেন।' উত্তর দেয় সিনথিয়া।

'তোমাদের সুবিধা-অসুবিধা আমাকে জানিও।' কথাগুলো বলতে বলতে আব্দুল হালিম সদলবলে মিথুনের শয্যাপাশে গেলেন এবং সান্ত্বনা সূচক কথা বললেন, তারপর সিনথিয়ার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হালিম সাহেবরা চলে যেতেই মিথুন সিনথিয়াকে প্রশ্ন করে, 'হালিম স্যার 'আর মাত্র তিনটে দিন' কেনো বললেন সিনথিয়া?'

মিথুনের প্রশ্নে চমকে ওঠে সিনথিয়া। নিজেকে সামলে নিয়ে ওর একটা হাত নিজের

হাতে তুলে নিয়ে উত্তরে বললো, 'উনি বলেছেন আর মাত্র তিনটে দিন পর থেকে তুমি সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করবে।'
মৃত্যু পথযাত্রী মিথুনকে এমন চরম মিথ্যা বলতে ওর মন সায় দিচ্ছিলো না। কিন্তু নির্মম সত্যিটাকে আড়াল করতেই ওকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো।

একে একে হাজার মন ভারী পাথরতুল্য আরো দুটো দিন গত হলো।
আর মাত্র একটি দিন। তারপরই সব শেষ। ওর জীবনে মিথুন হয়ে যাবে স্মৃতি। এমন মর্মান্তিক বাস্তবতার হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে ওঠে সিনথিয়া। দেয়ালে মাথা ঠোকে। ওপরের দিকে তাকিয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে, 'হে খোদা, এ কেমন লীলাখেলা তোমার? কেনো, কোন্ অপরাধে তুমি আমার মিথুনকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছো? কেনো নির্মম, নিষ্ঠুর আঘাতে আমার সুন্দর সংসারটা ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছো?'
কিন্তু ওপর থেকে সিনথিয়ার প্রশ্নের কোনো উত্তর ভেসে এলো না।
মিথুন আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এখন আর হাতটাও নাড়াতে পারে না। কথা বলতে গেলে মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। দেখলে কে বলবে, এই সেই মিথুন, যে শক্ত দুটো হাতে তুলে ফেলতো সিনথিয়ার দেহটা। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সিনথিয়া বলতো, 'এই ডাকাত, পড়ে যাবো তো! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।'

'মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি এ ব্যাধির হাত থেকে আর নিস্কৃতি পাবো না। আচ্ছা সিনথিয়া, আমি মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে, তাই না?'
নিজেকে ধরে রাখতে পারে না সিনথিয়া। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে

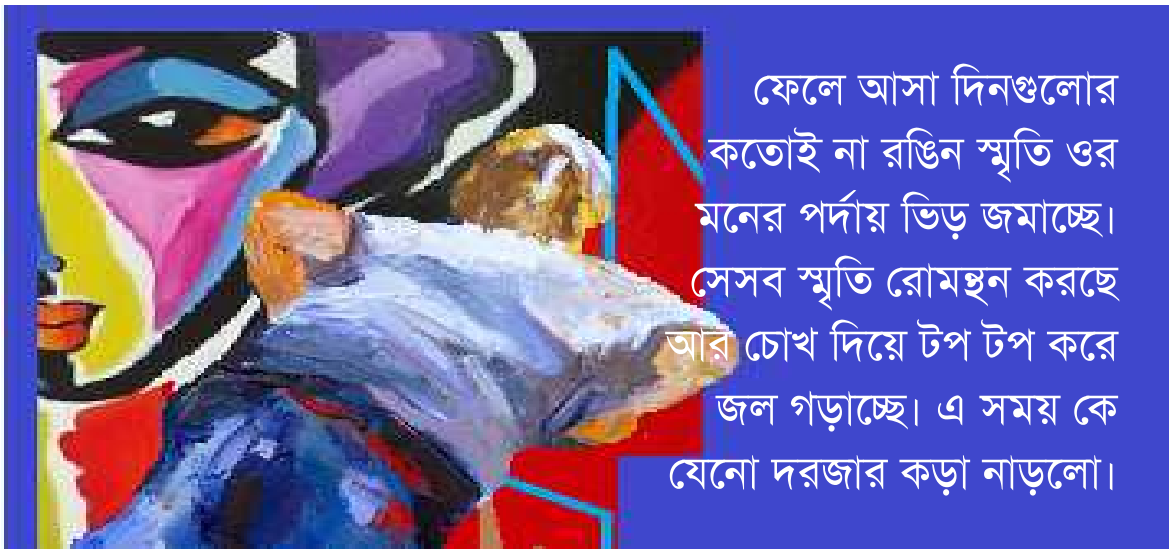

মিথুন আদুরে গলায় বলতো, 'ছেড়ে দেবো, যদি একটা পাপ্পি দাও।'

'অসভ্য!' ঝামটা মারতো সিনথিয়া।

সেই মিথুনের আজ একী দশা! সিনথিয়া বুক চাপড়ে বলে, 'খোদা, এমন দৃশ্য দেখার আগে আমার মরণ হলো না কেনো।'

'সিনথিয়া।' গলার স্বর আরো জড়িয়ে যাচ্ছে মিথুনের।

'কিছু বলবে জান?' মিথুনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সিনথিয়া।

'হ্যাঁ।'

'বলো।'

'তোমাকে একটা অনুরোধ করবো।' অনেক কষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করলো মিথুন।

'বলো।' মিথুনের ওপর আরো ঝুঁকে পড়ে সিনথিয়া।

'আমি বুঝতে পারছি, আমি আর বাঁচবো না।' ফ্যাকাশে চোখ ফেললো মিথুন সিনথিয়ার মুখের ওপর।

আর্তনাদ করে উঠলো সিনথিয়া, 'না, মিথুন, না, তুমি মরতে পারো না। তোমার সিনথিয়াকে ছেড়ে তুমি চলে যেতে পারো না।'

'সিনথিয়া।' আবার ডাকে মিথুন, 'বলো, আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে।'

আঁচলে চোখ-নাক মুছে সিনথিয়া বলে, 'বলো।'

শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলে অস্ফূট কণ্ঠে মিথুন উচ্চারণ করলো, 'আমি মরে গেলে তুমি আবার বিয়ে কোরো।'

'আল্লারে...!' আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠ সিনথিয়া।

এলো ষোলই এপ্রিল। ডাক্তারের কথানুযায়ী আজ দিনের কোনো এক সময় দেহ ছাড়বে মিথুন। এখন সে আর নড়ানড়া করতে পারছে না। কথা বলতে পারছে না। চোখ মেলে চাইছে না। বার বার ডেকেও সাড়া মিলছে না; তবে খাটো নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলছে। এদিকে সকাল থেকেই উদয়পুরের আবহাওয়া উত্তপ্ত। হালিম পক্ষ আর আফজাল পক্ষের মধ্যে শুরু হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। উভয় পক্ষের লোকজন কাটাবন্দুক, পিস্তল, রামদা'সহ মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। শোর-গোল, ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেলো। একটু পরই সব চুপচাপ।

বাইরের এ শোরগোল সিনথিয়াকে স্পর্শ করলো না। ও এক দুষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিথুনের মুখের দিকে। হঠাৎ খেয়াল করলো, মিথুনের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে! নাকের সামনে হাত রাখলো, না, শ্বাস নেই! বুকের ওপর কান পাতলো, ভেতোরের যন্ত্র নীরব! বুঝলো, সত্যি সত্যি মিথুন ওকে ছেড়ে চলে গেছে। চলে গেছে এ দুনিয়া ছেড়ে। ওর প্রাণহীন দেহটা আঁকড়ে ধরে ডুকড়ে কেঁদে উঠলো সিনথিয়া।
মিথুনের বিচ্ছেদ শোকে সিনথিয়ার বিলাপ যখন আকাশ বাতাস মথিত করে ফিরছে ঠিক তখন আব্দুল হালিম জনাকয়েক সঙ্গীসহ হন্তদন্ত হয়ে ওদের বাসায় প্রবেশ করলেন। আব্দুল হালিমকে দেখে ডুকড়ে কেঁদে উঠে সিনথিয়া বললো, 'স্যার, মিথুন নেই।'
লাশের একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন মিথুনের বাবা।
আব্দুল হালিম শান্ত মেজাজে ক্রন্দনরত সিনথিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেঁদো না মা। কাঁদলে মূর্দার আত্মা কষ্ট পায়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'দুনিয়াতে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। আমরাও একদিন চলে যাবো।' এরপর বেশ বিনয়ের সাথে আব্দুল হালিম বললেন, 'তোমার দুঃখে আমি দুখি মা; তবুও নিরুপায় হয়ে একটু সাহায্যের জন্য তোমার কাছেই ছুটে এসেছি।'
সিনথিয়া ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাকে আব্দুল হালিমের মুখের দিকে।
আব্দুল হালিম ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'তোমার স্বামীর লাশটা যে একটি দিনের জন্য আমাকে দিতে হবে মা।'
চমকে ওঠে সিনথিয়া।

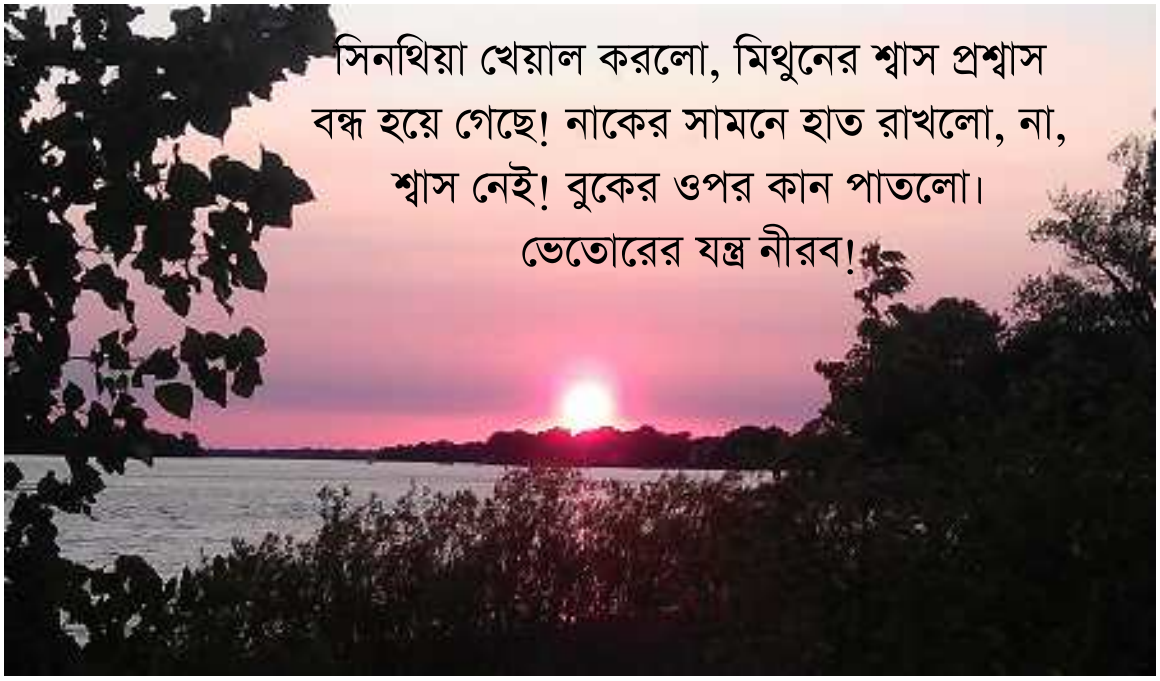

আব্দুল হালিম বললেন, 'আজ আফজাল কুত্তার লোকজনের সাথে আমার লোকজনের সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে অনেক আহত হলেও মারা যায়নি কেউ। কিন্তু আমার একটি লাশ চাই।' দাঁতে দাঁত চিবিয়ে আব্দুল হালিম বললেন, 'এবার আমি আফজালকে একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে চাই। তুমি আমাকে মিথুনের লাশটা দাও, কথা দিচ্ছি, লাশের কোনো ক্ষতি হবে না। আমার লোকেরা শুধু লাশটা নিয়ে মিছিল করবে, আর প্রচার করে দেবে আফজাল খানের লোকজনের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছে আব্দুল হালিম জুট মিলের সুপারভাইজার মিথুন আহমেদ। শয়তান আফজাল খানকে এবার আমি ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে ছাড়বো। তুমি অমত কোরো না মা।'

আব্দুল হালিমের কথা শুনে সিনথিয়ার কান্নাভেজা চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো দপ দপ করে জ্বলতে লাগলো। একদলা থুথু সে আব্দুল হালিমের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'তুই কি মানুষ, নাকি জানোয়ার?' এরপর মিথুনের লাশটি জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলো, 'না, না, এ লাশ আমি কাউকে দেবো না। আমার মিথুনের লাশ আমার কাছেই থাকবে। আমার মিথুন আমার বুকেই থাকবে।' ■

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালের ৯ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে। পরবর্তিতে তা স্থান পায় মিজান পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের 'সোরা গল্প' গ্রন্থটিতে। ॥

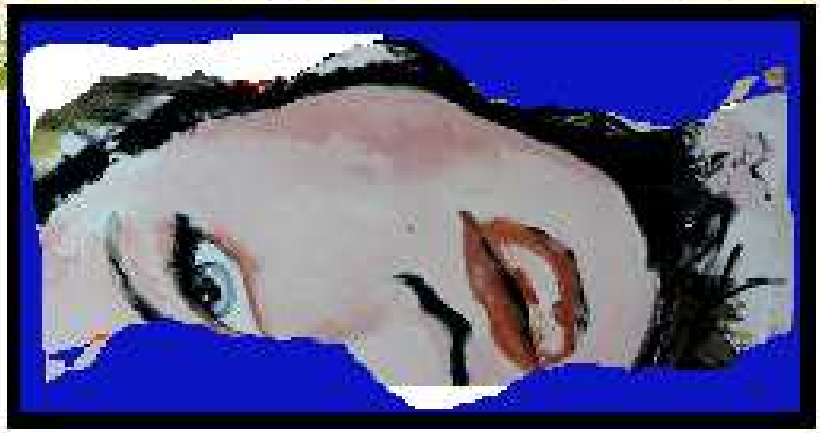

চলো গ্রামে ফিরে যাই

শাহানা আরিফকে বলে, 'চলো, আমরা গ্রামে ফিরে যাই।' শাহানার মুখে শিশুসুলভ কথা শুনে হাসে আরিফ। বলে,'গ্রামেই যদি চলে যাবো, তবে আর এতো কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ার হলাম কেনো?' আরিফের কথায় শাহানা বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, এ শহরটাকে আমার একদম ভালো লাগছে না...

পীরগাছা থানার অনন্তরাম গ্রামের সবুজে ঘেরা, ছায়া ঢাকা সুশীতল উঠোনটার কথা মনে পড়লে শাহানার মনটা গুমড়ে কেঁদে ওঠে। শাহানা যখন সেই একরত্তি মেয়েটি ছিলো তখন থেকেই সুনীবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো ছবির মতো সুন্দর উঠোনটার সঙ্গে। কাঁচা মাটির মাতাল করা গন্ধ বুকের গভীরে টেনে নিয়ে বড় সুখ পেতো সে। পড়াশোনার সময়টুকু বাদ দিয়ে বলতে গেলে দিনমান উঠোনটাতে চলতো ওর খেলাধুলা। ছুটোছুটি। কখনো কখনো উঠোনটাকে ওর কাছে মনে হতো মায়ের নরম, কোমল কোল। বুড়ো কাঁঠাল গাছটার তলায় মাদুরের ওপর শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তো তা সে নিজেও জানতো না।

শাহানাদের গোটা বাড়িটা গাছে গাছে ভরা। নানা জাতের গাছ। গাছগুলোর সাথেও ছিলো ওর চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। প্রতিদিন সকালে শাহানা ওদের কুশল জানতে চাইতো, 'কেমন আছো তোমরা?' গাছেরা ঝিকিমিক রোদমাখা ঝিরিঝিরি বাতাসে ডাল-পাতা নাড়ালে ও বুঝতো, ওরা ভালো আছে। আর ডাল-পাতা না নাড়ালে ও বুঝতো, ওরা ভালো নেই। ও তখন গুঁড়িতে হাত বুলিয়ে তাদের আদর করে দিতো। সেইসব গাছ, সেই ছবির মতো সুন্দর উঠোনটা ছেড়ে শাহানা আজ অনেক দূরে। এতো দূরে আসতে চায়নি সে। অনেক কেঁদেছে। কিন্তু বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর হাত ধরে বাবার ঘর ছাড়তেই হয়। পা বাড়াতে হয় নতুন এক জীবনের পথে। ইঞ্জিনিয়ার স্বামী গ্রামের নরম মাটির বুকে বেড়ে ওঠা শাহানাকে নিয়ে এলো ইট-পাথরের কঠিন শহর ঢাকায়। শান্তিনগরের একটি দশতলা এপার্টমেন্টের আটতলার একটি ফ্ল্যাটে হলো ওর নতুন ঠিকানা। স্বামীকে নিয়ে নতুন সংসার।

প্রথম প্রথম শাহানার ভীষণ খারাপ লাগতো। এখানে গাছে নেই, মাটি নেই। ইট আর পাথরে গাঁথা শক্ত শহরটায় মানুষগুলোর হৃদয়ও কেমন যেনো কঠিন আর কৃত্রিম! সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ইঞ্জিনিয়ার স্বামী আরিফও ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। সারাটা দিন থাকে বাইরে, আর চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ছটফট করে শাহানা। প্রথম প্রথম ভীষণ কান্নকাটি করতো। রাতে স্বামীর বুকে মুখ ডুবিয়ে কাঁদতো। আরিফ ওকে আদর আর সোহাগের ভেলায় চড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো এক রঙ্গীন দ্বীপে। শাহানা ভুলে যেতো সকল ব্যথা আর বেদনা। কিন্তু সকালে আরিফ অফিসে চলে গেলেই আবার পেয়ে বসতো নিঃসঙ্গতা। একাকীত্ব।

বাসায় একটা কাজের মেয়ে আছে। ওর নাম ফজিলা। বারো কি তেরো বয়স। ইট

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সামনে এগুতেই থমকে গেলো শাহানা! সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোক হঠাৎ করে ওর হাত চেপে ধরে বললো, 'মিনা, বাসায় চলো। বেবী ভীষণ কান্নাকাটি করছে।'

পাথরের এই কঠিন শহরের এক বস্তিতে বেড়ে উঠেছে ফজিলা। বয়সের তুলনায় বেশ ট্যাটনা। মাঝে মাঝে ফজিলাকেও অসহ্য মনে হতো শাহানার। এই টুকুন মেয়ে অথচ কথা বলে কী পাকা পাকা! প্রথম প্রথম তো বকাঝকাও করা যেতো না। একটা কিছু বললেই মুখের ওপর বলে উঠতো, 'দ্যাহেন আফা, এইহানে কাম করবার আইছি, আফনের বকা খাওনের লাইগ্যা আহি নাই। অত্যন্ত নরম মনের মানুষ শাহানার আদর-স্নেহে দিনে দিনে ফজিলাও বেশ নরম হয়েছে। আজকাল সে বলে, 'বুঝলেন আফা, মায়ে কয়, ঢাহা শহরডাতে ভালা মাইনষের ভাত নাই। শান্তিনগরে এক সাবের বাসায় কাম করবার গিয়া যে শিক্ষা হইছে হেইডা আর কি কমু। উঠতে-বইতে বিবিসাব তো বকাঝকা করতোই, লগে কিল-গুঁতা! আট মাস কাম করছি হেই বাসায়; কুনুদিন শান্তি পাই নাই। তহন ভাবতাম, এই দুনিয়াডায় বুঝি বালা মানুষ নাই; তয় আইজ দেখতাছি এই দুনিয়াডায়ও ভালা মানুষ আছে।'

শাহানা মিটিমিট হেসে বলে, 'তুই কোথায় সেই ভালো মানুষের দেখা পেলি?'

'এই বাসায়। আফনে।' আঙ্গুল উঁচিয়ে ফজিলা শাহানাকে দেখায়।

হাসে শাহানা।

নিঃসঙ্গ সময়ে ফজিলার সাথে কথা বলে, কিংবা বই পড়ে; অথবা গুণগুণ করে গান গেয়ে বা টেলিভিশন দেখে সময় কাটায় শাহানা। ওদের টেলিভিশনে ডিশের লাইন

আছে। বাইশটি চ্যানেল। বিটিভি আর ডিডি-সেভেন ছাড়া আর কোনো চ্যানেল শাহানার কাছে ভালো লাগে না। এ নিয়ে আরিফের সাথে ওর কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়। আরিফ বলে, 'ডিডি-সেভেনে উত্তম ও সূচিত্রার ছবি ছাড়া আর কিইবা দেখার আছে।'

শাহানা বলে, আছে আছে, আরো অনেক ভালো বাংলা ছবি আছে; যেগুলো ওরা দেখায়। ওদের ধারাবাহিক নাটকগুলোও মন্দ না। 'জন্মভূমি' তুমি নিয়মিত দেখলে বুঝতে.....

আরিফ জানে শাহানা সৌমিত্রের অন্ধভক্ত আর ডিডি-সেভেনে প্রতি সপ্তাহে সৌমিত্রের দু'একটা ছবি তো থাকেই। আরিফ শাহানাকে রাগানোর জন্য বলে, 'ডিডি-সেভেনে না হয় সৌমিত্র আছে, কিন্তু বিটিভিতে আছেটা কি?

রাগে না শাহানা; বরং উল্টো প্রশ্ন করে, 'কি নেই বিটিভিতে? নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান সবই তো আছে।'

আরিফ ওর নাকটা টিপে দিয়ে বলে, 'আরে গেঁয়ো মেয়ে, নাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের নামে বিটিভিতে যা দেখানো হয় তা আর বলতে.....

'আসলে জিটিভি, সনি, এমটিভি দেখে দেখে তোমাদের চোখ পচে গেছে, মন নষ্ট হয়ে গেছে!' ঝামটা মেরে কথাগুলো বলে শাহানা।

আরিফ ভীষণ ভালো ছেলে। আরিফের মতো চমৎকার মনের একটি ছেলেকে স্বামী হিসেবে পেয়ে শাহানা ভীষণ খুশী। আরিফ ওকে বুঝতে পারে নিবিড়ভাবে। বুঝতে পারে, গ্রামের বুকে বেড়ে ওঠা শাহানা শহরে এসে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। আরিফ বুঝতে পারে, ঢাকা শহরটাকে শাহানা মোটেও পছন্দ করছে না। প্রথম যেদিন আরিফের সাথে ঢাকা শহরে পা রাখলো শাহানা সেদিনই সে আরিফকে বলেছিলো, 'শোনো এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না, আমার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

আরিফ ওকে বোঝায়, 'এটা ঢাকা শহর। বাংলাদেশের রাজধানী। খুব সুন্দর শহর। ক'টা দিন থাকো, দেখবে বেশ ভালো লাগবে।'

'আসলে জিটিভি, সনি, এমটিভি দেখে দেখে তোমাদের চোখ পচে গেছে, মন নষ্ট হয়ে গেছে!' ঝামটা মেরে কথাগুলো বলে শাহানা।

কিন্তু দিনে দিনে বছর গড়ানোর পরও রাজধানী শহর ঢাকা গ্রামের মেয়ে শাহানার মন জয় করতে পারলো না। মাঝে মাঝেই শাহানা আরিফকে বলে, 'চলো, আমরা গ্রামে ফিরে যাই।'

শাহানার মুখে শিশুসুলভ কথা শুনে হাসে আরিফ। ওর গালটা টিপে দিয়ে বলে,'গ্রামেই যদি চলে যাবো, তবে আর এতো কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ার হলাম কেনো?'

আরিফের কথায় শাহানা বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'অনেকদিন হয়ে গেলো, তারপরও কেনো জানি এ শহরটাকে আমার একদম ভালো লাগছে না।'

আরিফ শাহানাকে পরামর্শ দেয়,' মন খারাপ হলে ফজিলাকে নিয়ে বাইরে থেকে ঘুরে আসবে। কিছু কেনাকাটার ইচ্ছে হলে মার্কেটে যেও।'

এখন শাহানা মার্কেটে যায় কেনাকাটা করার জন্য। এমনকি কাঁচা বাজারে পর্যন্ত যায়। সঙ্গে থাকে ফজিলা। মনটা ভালো না লাগলে ফজিলাকে নিয়ে শিশু পার্ক, ওয়ান্ডারল্যান্ড কিংবা যাদুঘরে যায়। এছাড়া আর ঢাকায় যাবার জায়গাইবা কোথায়? বখাটে আর সন্ত্রাসীদের উৎপাতে পার্কগুলোতে তো আর আজাকার ভদ্রলোকেরা পা বাড়াতে সাহসও করে না। অবশ্য ঢাকার রাস্তাঘাটেও পা ফেলে কি আর শান্তি আছে? ফুটপাত হকার, ফেরিওয়ালাদের অবৈধ দখলে! রাজপথে অসহনীয় যানজট! এতোসব সমস্যার মাঝে আবার গোটা রাজধানী জুড়ে কিলবিল করছে হাইজ্যাকার, ঠক, বাটপার, প্রতারক। কোথাও নেই নিরাপত্তা। মহিলাদের জন্য ঢাকা তো রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনই রোমহর্ষক সব খবরাখবর ছাপা হচ্ছে। প্রথম প্রথম বাইরে বেরুতে ভীষণ ভয় করতো শাহানার। ওর মনে সাহস যোগাতো পুচকে ফজিলা। বলতো, 'বুঝলেন আফা, এই ডাহা শহরে মুরগির লাহান কইলজা লইয়া চললে, পায়ে পায়ে বিপদ। মায়ে কইছে, ফজিলা, সব সময় বুকে সাহস লইয়া চলবি। কেউ তরে একখান কথা কইলে তুই তারে দুইখান হুনাই দিবি। কেউ তরে একটা মারলে তুই তারে দুইটা মারবি।'

ফজিলার কথা শুন হাসতো শাহানা। তবে দিনে দিনে বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বুঝতে পারে, ফজিলা মিথ্যা বলেনি। ফলে শাহানা বেশ সতর্কতার সাথে চলাফেরা করে। গুজোবের শহর ঢাকা। একেক সময় একেকটা গুজোব ছড়িয়ে পড়ে। এর কতোটা সত্যি আর কতোটা মিথ্যা বোঝা বড়ই দুস্কর। তবে সে গুজোবকে কেন্দ্র করে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।

বেশ ক'দিন যাবৎ ঢাকা শহর ছেলেধরার আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্থ। প্রতিদিন পত্রিকায় এ সংক্রান্ত সব ভয়াবহ সংবাদ ছাপা হচ্ছে। অবশ্য ইতিমধ্যে সে আতঙ্ক কিছুটা ঝিমিয়েও পড়েছে। তবে রটনা-ঘটনার কমতি নেই। একেই বলে হুজুগে বাঙ্গালি! একবার কোনো কিছু মাথায় ঢুকলে তা নিয়ে তুলকালাম কান্ড না ঘটা পর্যন্ত বাঙ্গালি যেনো দমে না।

ছেলেধরা সন্দেহে ইতিমধ্যে অনেক স্থানে অনেক নিরীহ মানুষও নির্যাতন ও গণধোরাইয়ে শিকার হয়েছে। পত্রিকায় শাহানা পড়েছে গণধোলাইয়ে মারাও গেছে ডজনখানেক লোক। এর মধ্যে পুড়িয়ে মারার মতো বর্বরতার দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে কে যে ছিলো ছেলেধরা, আর কে যে ছিলো নিরীহ মানুষ তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারেন না।

'আপনারা এই শয়তানটার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। আমি মিনা নই। আমার নাম শাহানা। ইঞ্জিনিয়ার আরিফ আমার স্বামী।'

একরাতে এ প্রসঙ্গে শাহানা আরিফকে প্রশ্ন করেছিলো, 'ছেলেধরা সন্দেহে শহরে এতো যে গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে এতে কি আসল ছেলেধরার দল ধোলাই হচ্ছে, নাকি ভোলাভালা সাধারণ মানুষ বাঙ্গালির হুজুগের শিকার হচ্ছে?'

উত্তরে আরিফ বলেছে, 'ঢাকা শহরটাই হচ্ছে রটনা-ঘটনা আর আতঙ্কের শহর। প্রতিদিন এখানে কতো যে ঘটনা ঘটছে তার কি আর ইয়ত্তা আছে! এতে কতো সাধু-সজ্জনও যে

নাজেহাল হচ্ছে সে হিসেব কে রাখে! তবে এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত অপরাধীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থাকে। নিরীহ লোকেরাই লাঞ্ছিত আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী'।

শাহানা প্রশ্ন করে, 'তাহলে শহরসুদ্ধ পুলিশেরা কী করে? তারা কি প্রকৃত অপরাধীদের ধরতে পারে না?'

আরিফ বলে, 'তুমি গ্রামের মেয়ে, সহজ-সরল তোমার মন। বুঝবে না অতোশতো। শুধু জেনে রাখো পুলিশ আর সেই পুলিশ নেই।'

আরিফের কথার মাথামুন্ড কিছুই বোঝেনা শাহানা। আরিফ বলে, 'এই শহরের সর্বত্র অপরাধী চক্র জাল বিছিয়ে রেখেছে। ছেলেধরা, নারী পাচারকারী, মাদক ব্যবসায়ী, হাইজ্যাকারদের স্বর্গরাজ্য এখন ঢাকা শহর। পরের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে, পরের বউকে নিজের বউ বলে দাবী করে পাচারকারীরা শিশু ও নারী পাচার করছে।'

স্বামীর বুক খামছে ধরে ভিত কণ্ঠে শাহানা বলে, 'তবে তো এখন থেকে আমাকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।'

আরিফ বলে, 'নিশ্চয়ই। তবে আজকাল তুমি বেশ চালাক হয়েছো, আর সে কারণে তোমাকে নিয়ে আমার ভয়ও কমেছে। প্রথম প্রথম তোমাকে নিয়ে আমার বেশ ভয় ছিলো।'

শাহানা হাসে। কিন্তু তখন কি আর সে জানতো, এর মাত্র ক'দিন পরই সে নিজেই হবে এক নিষ্ঠুরতম বাস্তবতার শিকার।

দিনটি ছিলো সোমবার। আরিফ প্রতি দিনের মতোই সকালে বেরিয়ে গেছে। দু'দিন থেকে ফজিলার জ্বর। শুয়ে শুয়ে মেয়েটি শুধুই কোঁকাচ্ছে। ওষুধ-পথ্য সবই চলছে। ফজিলা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর কাজের চাপ বেড়েছে। ঘর গোছানো, রান্না-বান্না করা, বাইরে থেকে এটা ওটা কিনে আনা সব এখন শাহানাকেই করতে হচ্ছে। আজও সব কাজ সেরে দুপুরের খাবার খেয়ে বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিলো। ইদানিং দুপুরে গড়িয়ে নেয়াটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আরিফ দুপুরে বাসায় খেতে আসে না। অফিসেই কিছু খেয়ে নেয়। শাহানা আরিফের কথা ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগতো আরিফ যদি এখন ওর পাশে থাকতো তবে কতোই না মজা হতো। আরিফের জন্য ওর মনটা হুহু করে ওঠে। আরিফকে শাহানা ভালোবাসে মন-প্রান উজার করে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা জন্মাতে পারে বিয়ের আগে সেটা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

থানায় জানানো হলো। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ করা হলো। পাগলের মতো ছুটোছুটি করে শাহানার কোনো সন্ধ্যান পেলো না আরিফ ও ওর বন্ধুরা।

মাঝে মাঝে একটা কথা ভেবে বেশ অবাক হয় শাহানা, কোথায় ছিলো আরিফ আর কোথায় ছিলো সে। আরিফ ছিলো সম্পূর্ণ অচেনা অজানা এক পুরুষ। অথচ বিয়ের মন্ত্র পাঠের পর সেই মানুষটিই হয়ে উঠলো ওর সব চাইতে আপনজন। প্রধান অবলম্বন। আজ সব চাওয়া-পাওয়া, সমস্ত ভালোবাসা ঐ মানুষটিকে ঘিরেই আবর্তিত। আজ শাহানা যেনো ভাবতেই পারে না যে, আরিফ কখনো ওর অপরিচিত ছিলো। আরিফকে কখনো সে চিনতো না, জানতো না। আরিফকে যেনো সে যুগ যুগ ধরে চেনে, আরিফ যেনো তার মন-প্রাণ আলো করা এক অমূল্য হীরক খন্ড। আরিফকে গভীরভাবে অনুভব করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ঘন্টা দু'য়েক পর ঘুম ভাঙ্গলো শাহানার। ঘড়ি দেখলো, চারটা বাজে। ওর মনে পড়লো টুকটাক কিছু কেনাকাটার কথা। তাছাড়া ফজিলার জন্য একটু ফলও আনতে হবে। প্রথম প্রথম মেয়েটাকে অপছন্দ করলেও এখন ওর প্রতি কেমন যেনো একটা মমতা জন্মে গেছে। শাড়িটা পাল্টে, হালকা সাজ-গোজ করে শাহানা বেরুলো শান্তিনগর বাজারের উদ্দেশে।রাস্তা জুড়ে জ্যাম। পাঁচ মিনিটের পথ পঁয়ত্রিশ মিনিটে পেড়িয়ে সে পৌঁছলো শান্তিনগর বাজারে। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সামনে এগুতেই থমকে গেলো সে! স্যুট-টাই পরা, সানগ্লাস চোখে আঁটা সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোক হঠাৎ করে ওর হাত চেপে ধরে বললো, 'মিনা, বাসায় চলো। বেবী ভীষণ কান্নাকাটি করছে।' ঘটনার আকস্মিকতায় থ' বনে গেলো শাহানা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই হাতটা ছাড়িয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ বিনয়ের সাথে বললো, 'দেখুন, আপনি ভুল করছেন। আমি মিনা নই। আমি মিসেস শাহানা।'

ওর কথা শুনে লোকটি হো হো করে হেসে উঠে বললো, ' ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি শাহানা। চলো, এবার বাসায় চলো।' পুনরায় লোকটা ওর হাত চেপে ধরলো।
শাহানা এবার চটে গলো। তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'হাত ছাড়ুন! বলছি তো আমি মিনা নই।'
লোকটা হাত তো ছাড়লোই না, বরং দরদমাখা কণ্ঠে বললো, 'ছিঃ লক্ষ্মীটি, রাস্তা-ঘাটে কি এমন নাটক করা ঠিক? লোকে কি বলবে! বাসায় চলো, সেখানে গিয়ে যতো ইচ্ছে বকাবকি কোরো। এই কসম করে বলছি, তুমি যদি আমাকে মারও দাও তবু কিছু বলবো না। প্লিজ, সোনা এবার বাসায় চলো; বেবী ভীষণ কান্নাকাটি করছে।'
লোকটার এমন ন্যাকামীভরা কথা শুনে ঘেন্নায় ওর শরীর রি রি করে ওঠলো। কষে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে হলো ইতোরটার গালো, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে আরো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, 'আপনার মতলবটা কি! কে আপনি, কী চান? বেশী ঝামেলা করলে আমি কিন্তু চিৎকার করে লোক জড়ো করবো।'
'ছিঃ মিনা, বাসায় গিয়ে যা ইচ্ছে কোরো। প্লিজ এখানে আর সিনক্রিয়েট কোরো না।' কথাগুলো বলতে বলতে লোকটি এবার আরো শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরলো।
এবার ভয় পেয়ে গেলো শাহানা। কিন্তু সাহস হারালো না। নিজের হাতটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে সে চিৎকার শুরু করলো, 'ইতোর, লম্টপ, ছোটলোক। ছাড়ুন, আমার হাত ছাড়ুন।'
ইতিমধ্যে ওদের দু'জনকে ঘিরে লোক জমতে শুরু করেছে। কোনো কোনো দর্শকের চোখের ভাষা এমন, যেনো বাঁদরের খেলা দেখছে। কেউবা হা করে গিলছে সুন্দরী শাহানার আকর্ষণীয় অঙ্গের সূধা। এরই মধ্যে একজন বয়স্ক লোক বলে উঠলো, 'তোমরা স্বামী-স্ত্রী ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে এ কী ধস্তাধস্তি শুরু করেছো!'
শাহানা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। সে কান্নাভরা কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি এই অসভ্যটার স্ত্রী নই। এই মাতালটা যা বলছে তা ঠিক নয়।'
ঠিক এ সময় ওর হাত চেপে ধরা লোকটা বলে উঠলো, 'আহ্, মিনা, কী যাতা বকছো! এবার বাসায় ফিরে একজন ভালো ডাক্তার দিয়ে তোমার মাথার চিকিৎসাটাই আগে করাবো।' এবার লোকটি জমে ওঠা পাবলিকের উদ্দেশে বলতে লাগলো, 'বুঝলেন ভাইয়েরা, ঘরের বউয়ের যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়, তবে স্বামীর জীবনটা কি আর জীবন থাকে! আমার জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই পাগল বউটা আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে মারলো। আর পারছিনে!' এরপর সে শাহানার দিকে ফিরে বললো, 'মিনা প্লিজ, বাসায় চলো।

বিশ্বাস করো আর কোনোদিন তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলবো না।' এরপর আবার দর্শকদের উদ্দেশে সে বলতে লাগলো, 'ভাইয়েরা, আমার পাগল স্ত্রীটা মাঝে মাঝেই এভাবে বিগড়ে যায়।বাসায় দেড় বছরের বাচ্চা রেখেই বেরিয়ে এসেছে। এ ঘটনা আজ নতুন নয়। এর আগেও পাঁচবার বাসা থেকে সে বেরিয়ে পড়েছিলো।'

এবার কান্নাভেজা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো শাহানা, 'আপনারা এই শয়তানটার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। আমি মিনা নই। আমার নাম শাহানা। ইঞ্জিনিয়ার আরিফ আমার স্বামী।'

পাবলিকের মাঝে একটা গুঞ্জরন দেখা দিলো। এক তরুণ এগিয়ে এসে শাহানার স্বামী বলে দাবীকারী লোকটিকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি যে ওনার স্বামী, তার প্রমান কি?'

ঠিক এ সময় ভীড় ঠেলে স্যুট-টাই আঁটা এক ভদ্রলোক (!) এসে শাহানার স্বামী বলে দাবীকারী লোকটির পিঠ চাপড়ে বললো, 'আরে দোস্ত, তুই এখানে!' এরপর শাহানার দিকে তাকিয়ে হাস্যমিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'আরে মিনা ভাবী যে, ও বুঝেছি আবার আপনার মাথাটা বিগড়ে গেছে!' এরপর পুনরায় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'বুঝি রে দোস্ত তোর যন্ত্রণাটা। ঘরের বউ পাগল হলে মনে কি আর শান্তি থাকে।'

যে তরুণটি শাহানার স্বামী বলে দাবীকারীকে প্রশ্ন করেছিলো, দ্বিতীয় লোকটির উপস্থিতিতে সে নিশ্চিত হলো যে, সত্যিই শাহানা তার স্ত্রী। নীরবে সরে পড়লো সে।

এবার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো শাহানা, 'ভাইসব, আপনারা এই শয়তানদের কথা বিশ্বাস করবেন না। খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমার মাথায় কোনো দোষ নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্ একজন মানুষ। আমার নাম মিনা নয়, আমি শাহানা।'

'ছিঃ মিনা, পথের ওপর এভাবে স্বামীকে আর কতো ছোট করবে।' এরপর লোকটি জমে ওঠা পাবলিকের উদ্দেশে বললো, 'বুঝলেন ভাইয়েরা, একেই বলে কপাল। বউ সুন্দরী, তবে মাথা খারাপ! ঘরে তো শান্তি নেই; পথে-ঘাটেও হতে হয় নাজেহাল।' এরপর সে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'দোস্ত একটু হেলপ কর। একটা বেবিট্যাক্সি ডেকে আন। কসম করে বলছি, এখন থেকে তোর ভাবীকে ঘরে তালাবদ্ধ করেই রাখবো।'

বন্ধুর কথা শুনে বন্ধু হেসে বেবিট্যাক্সি আনতে ছুটলো। পাবলিকের মাঝেও একটা উল্লাস লক্ষ্য করা গেলো, যেনো খেলোয়াড় বাঁদরটা রিংয়ের ভেতোর দিয়ে লাফ মারলো। কোনো কোনো দর্শক রস ঝরিয়ে বলে উঠলো, 'ভায়া এভাবে পথে প্রান্তরে নাটক-সিনেমা না করে এবার একটা ভালো ডাক্তার দিয়ে বউয়ের চিকিৎসা করান।'

'কেনো জানি এ শহরটাতে আমার একদম ভালো লাগছে না। আরিফ, চলো আমরা গ্রামে ফিরে যাই।'

হাসির রোল পড়লো পাবলিকের মাঝে। কেউ বললো, 'এমন পাগল বউয়ের সাথে ঘর করলে কবে যে গণধোলাই খেয়ে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবেন তা কে জানে।' পাবলিকের এ জাতীয় মন্তব্য আর হাস্যরসের তলায় চাপা পড়ে গেলো শাহানার বক্ষবিদীর্ণ চিৎকার। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বন্ধুটি একটা বেবিট্যাক্সি ডেকে আনলো। এবং দুই বন্ধু মিলে টেনে-হিঁচড়ে শাহানাকে বেবিতে তুললো। উপস্থিত দর্শকরা বেশ উপভোগ করলো দৃশ্যটা। বিশেষ করে যারা এতোক্ষণ সুন্দরী শাহানার সোনালি অঙ্গের আরো খানিকটা অবলোকন করার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলো তাদের খায়েশও পূর্ণ হলো। কেননা এই দুই দুর্বৃত্ত যখন টানা-হ্যাঁচড়া করে শাহানাকে বেবিট্যাক্সিতে তুলছিলো তখন তার দেহের অনেক অংশই অনাবৃত হয়ে গিয়েছিলো।

ভটভট শব্দ তুলে বেবিট্যাক্সিটা কাকরাইলের পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এদিকে অফিস শেষ করে সন্ধ্যা নাগাদ বাসায় ফিরলো আরিফ। 'শাহানা', 'শাহানা' করে চিৎকার করেও যখন শাহানার কোনো সাড়া পেলো না তখন সার্ভেন্ট রুমে গিয়ে অসুস্থ ফজিলাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর আপা কোথায় রে?'

ফজিলা কোঁকিয়ে কোঁকিয়ে জানালো, 'আফা হেই বৈকাল বেলা বাজারে গেছে, অহনও ফিরে নাই।'

আকাশ ভেঙ্গে পড়লো আরিফের মাথায়। হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। না, সন্ধ্যার সময় শাহানার এভাবে বাইরে থাকার কথা নয়।

ফ্ল্যাটের দুই গোছা চাবি। এক গোছা শাহানার কাছে আর অপরটা থাকে আরিফের কাছে। অফিস থেকে ফিরে আরিফ খুব একটা কলিং বেল টেপে না। সরাসরি নিজের চাবি ব্যবহার করে বাসায় ঢুকে পড়ে। এভাবে বাসায় ঢুকে একেক সময় একেক কায়দায় সে শাহানাকে চমকে দেয়। একবার তো নিঃশব্দে বাসায় প্রবেশ করে চুপি চুপি

স্টোর রুমে ঢুকে বেড়ালের মতো মিঁউ মিঁউ শব্দ করতে লাগলো।
শাহানা অবাক হলো বাসার ভেতোর বেড়ালের ডাক শুনে। কৌতুহল নিয়ে স্টোর রুমের লাইট জ্বালিয়ে যেইনা দরজাটা ফাঁক করেছে অমনি লাফিয়ে প্রিয় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়লো আরিফ। জড়িয়ে ধরার সময় নিজের ঠোঁট দুটো এমনভাবে শাহানার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরেছিলো যে, বেচারী শাহানার শব্দ করারও উপায় ছিলো না। শুধু ভয়ে আতঙ্কে চোখ দুটো রসগোল্লার আকার ধারণ করেছিলো।
আজও চুপিসারে বাসায় প্রবেশ করেছিলো আরিফ। আজও আলমারিটার পাশে লুকিয়ে থেকে অনেকক্ষণ বেড়ালের মতো আওয়াজ করেছে, কিন্তু সাড়া মেলেনি শাহানার। এক সময় বেড়ালের ডাক বন্ধ করে 'শাহানা', 'শাহানা' বলে ডাকতে লাগলো, কিন্তু তারপরও কোনো সাড়া মিললো না।
মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগলো আরিফের। পাশের ফ্ল্যাটগুলোতে খোঁজ করলো কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলো না। যদিও আরিফ জানে, শাহানা অন্যের বাসায় খুব একটা যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধ্যান না পেয়ে টেলিফোন করলো দুই বন্ধু অনল ও অপুর কাছে। অনল ওর স্ত্রী আরশিকে নিয়ে, আর অপু একাই এলো।
থানায় জানানো হলো। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ করা হলো। পাগলের মতো ছুটোছুটি করে শাহানার কোনো সন্ধ্যান পেলো না আরিফ ও ওর বন্ধুরা।
দুইদিন গত হয়ে গেলো। তিনদিনের মাথায় দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় ছাপা হলো শাহানার মৃতদেহের ছবি। যার নিচে হেডলাইন দেয়া হয়েছে, 'লজ্জায়, ঘৃণায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন শাহানা'। ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে, মৃতার মুষ্ঠিতে প্রাপ্ত চিরকূট থেকে জানা যায়, তার নাম শাহানা। পড়েছিলো এক নারী পাচারকারী দলের খপ্পরে। নানা ফন্দি-ফিকির করে এক সময় পাচাকারীদের খপ্পর থেকে পালাতে সক্ষম হলেও নারী জীবনের সর্বস্ব হারানোর লজ্জায়, ঘৃণায় বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। চিরকূটের এক স্থানে লেখা ছিলো, 'প্রিয় আরিফ, আমাকে ক্ষমা কোরো।'
পত্রিকায় সংবাদটা পড়ে পাগলের মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো আরিফ। ওর কানের কাছে বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো শাহানার সেই কথাগুলো, 'কেনো জানি এ শহরটাতে আমার একদম ভালো লাগছে না। আরিফ, চলো আমরা গ্রামে ফিরে যাই।'

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে ২৮ আগষ্ট, ১৯৯৮ সালে। পরে তা স্থান পায় ২০০০ সালে বিশ্ব সাহিত্য ভবন কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের 'গল্পসমগ্র' গ্রন্থটিতে। ॥

অফিস পাড়ার সুন্দরী

গল্প-তিন

বিবেকের দংশনে, দ্বীধা-সংকোচে একেবারে যেনো কুঁকড়ে গেছে জোহান। কিন্তু মেয়েটি স্বাভাবিক! কোনো দ্বিধা নেই; নেই কোনো সংকোচ। ভাবখানা এমন, ও যেনো জোহানের অনেক দিনের চেনা। অনেক বেশী আপন। একেবারে ঘরের মানুষ.....

মেয়েটি দেখতে এক কথায় চমৎকার। কিসের সাথে তুলনা করা যায়? হ্যাঁ, একটা সাদা গোলাপ। একটু লাল রঙ মেশানো। যাকে বলে একেবারে চোখ জুড়ানো রঙ। পিচ্ছিল ত্বক। এ যুগের মেয়েদের বড় আকাঙ্খা আর যত্নের জিনিস। চোখ পিছলে যায়। বেশ লম্বা। তড়তড়ে গড়ন। প্রমিলা ক্রীড়াবিদদের মতো শরীর। এক ফোঁটা মেদও নেই। সরু কোমড়। পিছনটা বেশ বড়, তবে বেঢপ নয়। বলা যায় বেশ পুষ্ট। নজর আটকে যায় আঁঠার মতো। লম্বা পায়ে সেঁটে আছে স্কিনটাইট জিন্স। হাত জোড়া ধবধবে ফর্সা, সরু, সুন্দর। লম্বা নখ। চোখ আর কপাল? অসম্ভব সুন্দর। আকর্ষণীয় কালো চোখের মণি। হাসি যেনো সব সময়ই লেগে আছে দৃষ্টিযুগলে। লম্বাটে মুখ। গলা ও গ্রীবা সামান্য দীর্ঘ। ধবধবে সাদা দাঁতের পাটি। পিঠ অবদি শ্যাম্পু করা খোলা চুল। ইন করে পরা ক্রিম কালারের সার্ট হালকা নীল জিন্সের সাথে চমৎকার ম্যাচ করেছে। সরু কোমড়টাকে বেঁধে রেখেছে কালো মোটা চামড়ার বেল্ট। চিকন কব্জিতে সোনালী ব্রেসলেট। পায়ে লম্বা পেন্সিল সু। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ। বেশ ছোট। চার কোণা বক্সের মতো। সব মিলিয়ে মেয়েটির রূপকে কিসের সাথে তুলনা করা যায়? হ্যাঁ, বিদ্যুতের ঝিলিক। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বুকের ভেতোর শুরু হয় ঢেঁকির ধাপুর ধুপুর।

মেয়েটি বললো, আমাকে চিনতে পারলেন না?

মধুর কন্ঠ। অমন রূপের সাথে এমন মধুর কন্ঠ ছাড়া মানাবেই বা কেনো। বিধাতা তো সবই উজার করে দিয়েছেন। কন্ঠটা এমন মাধুর্য্যভরা না দিলে ওর প্রতি বড্ড অবিচার করা হতো।

জোহান ফেলে আসা স্মৃতি হাতড়াতে থাকে। অতীতের ক্যানভাসে খুঁজতে থাকে এমন একটা মুখ। কিন্তু না, খুঁজে পায় না।

মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মিটিমিটি হাসছে।

জোহান বেশ অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

বসতে বলবেন না? মেয়েটি জানতে চাইলো।

জ্বী, বসুন। লজ্জা মেশানো কন্ঠ জোহানের।

মেয়েটি বসলো। ওর মুখোমুখি। মরা দুপুর। নীরব অফিস। এখন লাঞ্চের সময়। লোকজনের উপস্থিতি কম। জোহান অফিসেই লাঞ্চ সারে। বাইরের খাবার সে খায় না।

ড্রাইভার বাসা থেকে নিয়ে আসে। নাবিলা খুব সুন্দর রাঁধতে পারে। রান্নার পর নিজেই পরিপাটি করে সাজিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারে করে পাঠিয়ে দেয়। কোনো কোনো দিন সে নিজেও আসে। সেদিন ওরা দু'জনে একত্রে বসে খায়। একা একা খাওয়ার চাইতে নাবিলার সাথে খেয়ে অনেক বেশী তৃপ্তি পায় জোহান। নাবিলার পরিবেশনাও চমৎকার। মমত্বভরা। পরম ভালোবাসার সুতোয় বোনা। নাবিলা সব সময় কাঁচের চুরি পরে। লাল, হলুদ আর নীল চুরি ওর পছন্দ। খাবার পরিবেশনের সময় ওর চুরির মিষ্টি রিনিঝিনি শব্দ দারুণ লাগে জোহানের।

আজ নাবিলা আসেনি। খাবার পাঠিয়েছে। হাতের শেষ ফাইলটা দেখে খেতে বসবে মনস্থির করেছিলো জোহান। কিন্তু ফাইলটা দেখা শেষ হতেই রুমের দরজায় টোকা পড়লো; এবং প্রায় সাথে সাথেই সম্মতির অপেক্ষা না করেই প্রবেশ করলো এই অনিন্দ্য সুন্দরী।

আপনি কি কিছু ভাবছেন? প্রশ্ন করে মেয়েটি।

জ্বী, না। কথাটা মুখে বললেও জোহানের মাথার ভেতোর যে একটা ভাবনার ফ্যান বনবন করে ঘুরছে সে মুখভাবটা আড়াল করতে পারলো না। আসলে এমন পরিস্থিতিতে সেটা আড়াল করা যায় না।

লাঞ্চ করেছেন? আবার প্রশ্ন।

না।

চলুন না কোথাও গিয়ে দু'জনে মিলে লাঞ্চটা সেরে নেয়া যাক। লাঞ্চও হবে, চুটিয়ে গল্পও করা যাবে।

দুপুরের খাবারটা আমার স্ত্রী বাসা থেকেই পাঠায়।

আজও নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে?

হ্যাঁ।

তা হলে আর দেরী করছেন কেনো! শুরু করুন।

জোহান একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়লো। একটি মেয়েকে সামনে বসিয়ে রেখে কি করে লাঞ্চ সারবে সে? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে।

ওর মনের অবস্থাটা আঁচ করতে পারে মেয়েটি। ঝকঝকে দাঁত বের করে একমুখ হাসি উপহার দিয়ে বলে, এতো ভাবাভাবির কি আছে! আমার সামনে এখন আপনি দুটো প্রস্তাব রাখতে পারেন। এক. আমাকে বলতে পারেন, আপনি একটু বাইরে গিয়ে বসুন, আমি লাঞ্চটা সেরে নেই।

জোহান ভেতোরে ভেতোরে ভীষণরকম চমকে ওঠে। ওর মনে হলো, আচমকা হলেও ঘটে যেতে পারে এক প্রলয়ঙ্কারি ঘটনা.....

দুই. যা আছে আসুন না দু'জনেই ভাগাভাগি করে খেয়ে নেই। তবে তার আগে একটা কথা বলে দেই, ভাগাভাগি করে খেতে আমার কোনোই আপত্তি নেই। অবশ্য ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ।

কে এই মেয়ে? এতো সহজ আর স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে! মনে হয় অনেক দিনের চেনা। বহু বছরের জানাশোনা! ভাবে জোহান। ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে। অনিচ্ছা সত্বেও সে মেয়েটিকে বললো, তবে আসুন, যা আছে সেটাই ভাগাভাগি করে খেয়ে নেই।

মেয়েটি বললো, আগেই বলেছি পেটে বড্ড খিদে। আমার কোনো আপত্তি নেই।

জোহান পিওন সামসুকে ডাকলো, এবং খাবার দিতে বললো; সাথে দুটো প্লেটের কথাও বললো। সামসু টেবিলের ওপর টিফিন ক্যারিয়ার, প্লেট, গ্লাস আর পানি রেখে গেলো।

মেয়েটি বললো, এবার আপনি চুপচাপ বসে থাকুন, বাকি কাজটা মেয়েদের। আর সেটা আমাকেই করতে দিন।

জোহানের মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো। কিন্তু কিছু বলার আগেই টিফিন ক্যারিয়ার খুলে ফেললো মেয়েটি। গরুর মাংস ভূনা, ছোট মাছের চর্চ্চরি, ডাল আর বাসমতি চালের ভাত।

-ওয়াও, দারুণ খুশবু! মনে হচ্ছে চমৎকার রান্না। কে রাঁধে?

-আমার স্ত্রী। উত্তর দেয় জোহান।

-টোটালি হাউজ ওয়াইফ?

-হ্যাঁ।
-তাই বলুন।
মেয়েটা জোহানের প্লেটে ভাত তুলে দেয়। এরপর গরুর মাংস আর চর্চ্চরি। জোহানের মনের ভেতোর অসম্ভব খঁচখঁচ করছে। সে ভাবতেও পারছে যে, নিজের অফিস রুমে বসে একটা অপরিচিত মেয়ের সাথে লাঞ্চ করছে। শুধু তাই নয়, মেয়েটা ওকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছে! বিয়ের পর থেকে যে দায়িত্বটি পালন করে আসছে কেবল মাত্র ওর স্ত্রী নাবিলা। হঠাৎ ওর মনে বিদ্যুৎ খেলে যায়, আচ্ছা, এখন যদি নাবিলা এখানে এসে পড়ে, এবং এই দৃশ্য দেখে ফেলে? জোহান ভেতোরে ভেতোরে ভীষণরকম চমকে ওঠে। ওর মনে হলো, আচমকা হলেও ঘটে যেতে পারে এক প্রলয়ঙ্কারি ঘটনা। লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে ওর সাজনো-গোছানো সংসার নামের ছোট্ট জগতটা। চমৎকার সে জগত। আসলে বিয়ে না করলে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না। এই তো গতকাল রাতেই সে নাবিলাকে বলেছে, 'সত্যি বলছি নাবিলা, তোমার সাথে ঘর বাঁধার পর আমার জীবনটাই পাল্টে গেছে।' জোহার এখন বেশ উপলব্ধি করে, নাবিলা ওর বুকের জমিনে শীতের নীল আকাশের উজ্জ্বল, নির্মল রোদ্দুর। সুগভীর শান্তি আর অফুরন্ত সৌন্দর্য! স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার স্বপ্নিল সুতো দিয়ে বোনা আগাগোড়া ঠাস বুননি।
-নিন শুরু করুন। জেহানকে খেতে শুরু করার আহ্বান জানিয়ে মেয়েটি এক গাল ভাত মুখে দিয়েই বলে উঠলো, এক্সিলেন্ট! বলতেই হবে, আপনার বউয়ের হাতে যাদু আছে।
জোহান খেতে শুরু করলো বটে। তবে ভাত ওর গলা দিয়ে নামছে না। খাদ্যনালী যেনো বুজে আছে এক অপ্রত্যাশিত টর্ণেডোর আশঙ্কায়। বিবেকের দংশনে, দ্বীধা-সংকোচে একেবারে যেনো কুঁকড়ে গেছে সে। কিন্তু মেয়েটি স্বাভাবিক! কোনো দ্বিধা নেই; নেই কোনো সংকোচ। ভাবখানা এমন, ও যেনো জোহানের অনেক দিনের চেনা। অনেক বেশী আপন। একেবারে ঘরের মানুষ।
-এবার একটু ডাল দেই? আপনার বউ কিন্তু ডালটাও চমৎকার রেঁধেছে! পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না করা ডাল আমার ভীষণ পছন্দ।
মেয়েটা জোহানের পাতে ডাল ঢেলে দিলো। এরপর বললো, আপনার বউটি বুঝি খুব সুন্দরী? একটু থেমে নিজের প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই দিলো, হতেই হবে। এতো যার গুণ, সে সুন্দরী না হয়ে পারে না। আচ্ছা, আপনাদের কি প্রেমের বিয়ে?
মেয়েটির উদ্দেশ্য কি? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে জোহান।

অফিসের কোনো কাজে এসেছে বলে তো মনে হয় না। নানা প্রশ্ন, নানা সংশয় জোহানের মাথার ভেতোর গুঁতোগুঁতি করছে।

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো। জোহান জানে এটা নাবিলার ফোন। জানতে চাইবে, 'খেয়েছো? কেমন হয়েছে আজকের রান্নাটা? একা একা খেতে বুঝি খুব খারাপ লাগছে?' এটা নাবিলার রুটিনমাফিক জিজ্ঞাসা। প্রতিদিনের প্রশ্ন। কোনোদিন এতে ভুল হয় না।

আরো একবার বাজলো টেলিফোনটা। জোহান হাত বাড়ালো ফোনের দিকে, কিন্তু তার আগেই ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিয়ে মেয়েটি জোহানকে বললো, খাওয়ার সময় আপনাকে টেলিফোনে এ্যাটেন্ড করতে হবে না। আমিই দেখছি, কে ফোন করেছে, হ্যালো.....। কলজে শুকিয়ে গেলো জোহানের। মাথার ভেতোর মগজ গলতে শুরু করলো। টেনশন ভাঙ্গছে বুকের পাঁজরের হাড়। গরমের ঝাঁজে যেমন ঝাঁপসা হয়ে যায় মনের আকাশ, কেমন যেনো ঘোলা নীল। ঠিক যেনো মূর্চ্ছিত মানুষের খোলা চোখের মতো জোহানের চোখ দুটো স্থির টেলিফোনে আলাপরত মেয়েটির মুখের ওপর।

জোহান মেয়েটির হাত থেকে টেলিফোনটা নিলো। হতভম্ভ, বিমূঢ়, নির্বাক জোহান যেনো কেঁদে ফেলবে। গলা ঠেলে কোনো শব্দ বেরুচ্ছে না। কি বলবে সে নাবিলাকে, মেয়েটিকে সে চেনে না? চেনা চেনা মনে হলেও শিওর হতে পারছে না কোথায় তাকে প্রথম কবে দেখেছে? নাবিলা কি ওর কথা বিশ্বাস করবে?

-আপনি কে বলছেন? প্রশ্ন করে মেয়েটি।....জ্বী, উনি রুমেই আছেন...খাচ্ছেন।....আমি কে?...জ্বী, আমি জোহানের বান্ধবী বলছি....প্লিজ, আপনি কে বলছেন? ও ভাবী? স্লামোলাইকুম।

জোহান হতভম্ভ। কি বলবে, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

কলকলিয়ে কথা বলে চলেছে মেয়েটি,...সবার আগে বলুন তো ভাবী, আপনি এতো সুন্দর রাঁধতে পারেন কী করে?.... এখন আমি ও আপনার স্বামী একত্রে বসে আপনার হাতের রান্না খাচ্ছি। দারুণ! এক্সিলেন্ট!.....হ্যাঁ ভাবী, বিশ্বাস করুন একবর্ণও মিথ্যা বলছি না।...আমি জোহানের ইউনির্ভাসিটি লাইফের বান্ধবী। বলতে পারেন এক সময় জোহানের হৃদয়ের রাণী ছিলাম। ক্যাম্পাসে সারাক্ষণ ও আমার পেছনে ঘুরঘুর করতো। আনস্মার্ট, আনকালচার্ড বলে আমি ওকে পাত্তাই দিতাম না।

জোহান ঘামতে শুরু করেছে। ওর কণ্ঠনালি শুকিয়ে গেছে।

বলে চলেছে মেয়েটি,...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর সাথে এখনো আমার হট লাইন রয়েছে। আপনিই বলুন, তা না হলে ওরই অফিসে এসে একসাথে বসে খাচ্ছি কেমন করে?.....কি বললেন, জোহান আমার সম্পর্কে আপনাকে কিছুই বলেনি! স্ট্রেইঞ্জ!

এবার মেয়েটি রহস্যময় হাসি হেসে জোহানের দিকে তাকিয়ে টেলিফোনটা আরো মুখের কাছে নিয়ে বললো, এই জোহান, ফাজিল, তুমি আমার সম্পর্কে তোমার বউয়ের কাছে দেখছি কিছুই বলোনি! সে তো বলছে, আমার নামই নাকি শোনেনি!.....বুঝলেন ভাবী, শালার পুরুষ মানুষের এই একটা দোষ, বউয়ের কাছে তথ্য গোপন করে। সে যাক ভাবী, এবার রাখি। খাওয়া আর কথা একসাথে জমছে না। তার চাইতে জোহানের সাথে একদিন বাসায় গিয়ে আপনার সাথে চুটিয়ে আড্ডা মারবো। বাই।

মেয়েটি রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরে জোহানের দিকে, নিন এবার আপনার পালা। আপনার মিসেস আপনার সাথে কথা বলবে।

জোহান মেয়েটির হাত থেকে টেলিফোনটা নিলো। হতভম্ভ, বিমূঢ়, নির্বাক জোহান যেনো কেঁদে ফেলবে। গলা ঠেলে কোনো শব্দ বেরুচ্ছে না। কি বলবে সে নাবিলাকে, মেয়েটাকে সে চেনে না? চেনা চেনা মনে হলেও শিওর হতে পারছে না কোথায় তাকে প্রথম কবে দেখেছে? নাবিলা কি ওর কথা বিশ্বাস করবে? মেয়েটি এতোক্ষণ নাবিলার সাথে যেভাবে কথা বলেছে তাতে ওর কোনো কথা নাবিলার বিশ্বাস না করাটাই তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া সে কিভাবেই বা বলবে, মেয়েটি এখন ওর সাথে বসে খাচ্ছে না।

জোহানের কণ্ঠ চিরে কোনো কথা বেরুচ্ছে না; অপরদিকে 'হ্যালো' 'হ্যালো' বলে চিৎকার করে করে গলা ফাটিয়ে ফেলছে নাবিলা। এক সময় অপরপ্রান্তে নাবিলাই রেখে দিলো রিসিভারটা।

জোহানের এখন মনে হচ্ছে, ও আর নাবিলা দেব-দেবীর মতো শরতের চোখ জুড়ানো কলঙ্কহীন নীলাকাশে একখন্ড শুভ্র সাদা মেঘের ওপর মালতি সুগন্ধি হাওয়ার হিল্লোলে যে সম্পর্ক রচনা করেছে, সেখানে ধেয়ে আসছে পচা-মজা, স্যাঁতস্যাঁতে বর্ষাকাল। টানা ঝমঝমে বর্ষণ। যেদিকে চোখ যায় ফ্যাকাশে রঙ। হৃদয়ে ভীষণরকম মোচড় অনুভব করে সে। জোহান জানে, এসব ব্যাপারে বড়ই স্পর্শকাতর মেয়ে নাবিলা। ফুলশয্যার রাতেই সে ওকে বলে দিয়েছে, আর যাই করো, আমার বাইরে কোনো মেয়ের ওপর চোখ ফেলো না।

জোহানের মনে হলো, সোনালি জমিনে চড়ে বেড়ানো দুটি শালিকের একটি উড়ে চলে যাচ্ছে, আর একটি গোবর ঠোঁকরাচ্ছে। আলো মরে যাচ্ছে। জীবনের উজ্জ্বল রোদ এখন যেনো চলে যাবার জন্য ব্যস্ত। বড় অভিমানি মেয়ে নাবিলা।

জোহানের মনের ভেতোর যখন চলছে আষাঢ়ি ভাঙ্গন, তখনও সামনে বসা মেয়েটির কোনো বিকার নেই। সে অবলীলাক্রমে খাওয়া শেষ করলো। হাসিমুখে টিস্যু বক্স থেকে টিস্যু নিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললো, ভাবীর সাথে একটু রসিকতা করলাম। কিছু মনে করবেন না। নিন, ঝটপট খাওয়া শেষ করুন। টিফিন ক্যারিয়ার আর প্লেট দুটো ধুয়ে দিই।

অফিসে এলে ওর সাথে খাওয়া শেষ করে এভাবেই কথা বলে নাবিলা। জোহান বলে, রাখো তো, তোমার ওসব করতে হবে না। পিওনটাকে ডাকছি। সে সব ধুয়ে দেবে। কিন্তু নাবিলা ওর কথা কানে না তুলে অফিসরুম সংলগ্ন বাথরুমের বেসিনে গিয়ে এঁটো সবকিছু ধুয়ে-মুছে আনবে।

কি হলো, আরে বাবা আগে খাওয়া শেষ করুন। তাগিদ দেয় মেয়েটি।

জোহানের ভেতোরে রাগ, ক্ষোভ আর ঘৃণার তুফান। মুখ কোনো কথা নেই। খাওয়া শেষ না করেই সে উঠে দাঁড়ালো। বেসিনে হাত ধুয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসে আগুনঝরা চোখ রাখলো মেয়েটির ওপর। তারপর তপ্ত কণ্ঠে বললো, আপনি একটা বাজে, নোংরা মেয়ে। অনেক ভদ্রতা দেখিয়েছি, আর নয়। এবার আপনি আসতে পারেন।

মেয়েটি কোনো কথা না বলে এঁটো থালাবাটিগুলো বেসিন থেকে ধুয়ে নিয়ে এলো। এরপর টিফিন ক্যারিয়ারটা গুছিয়ে দিয়ে বললো, ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে না।

তেঁতো কণ্ঠে জোহান বললো, আপনার আবার ভদ্রতা জ্ঞান আছে নাকি?
মেয়েটি হাসলো। রহস্যময় সে হাসি। হাত দুটো মেলালো নমস্কারের ভঙ্গিতে। ঠোঁটে ছোঁয়ালো তর্জনি জোড়া, এরপর বললো, অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। এবার আমিই উঠবো।
বদলে গেলো মেয়েটার চেহারা। সুন্দরের বুকে জেগে উঠলো পাথুরে রূপ। কঠিন হলো কণ্ঠ, দিন দেখি ঝটপট হাজার দশেক টাকা, ঘড়ি, মোবাইল, চেইনসহ যা কিছু আছে। তা না হলে আরো কেলঙ্কারি বাড়বে। মেয়েটি আরো বললো, ব্যাগে পিস্তল আছে, বাইরে সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে আছে। কুইক। হাতে সময় কম।

কি করবে জোহান এখন। সংসারে তো কেলেঙ্কারি ঢুকেই গেছে; এবার ঢুকবে অফিসে। এই সুন্দরী মেয়েটা এখন অনেক কিছুই করতে পারে, যা হতে পারে ওর জন্য মারাত্মক। অপূরণীয় ক্ষতিকর। তবে এখন ওর করণীয়? বুকের ভেতোর টেনশনের উলঙ্গ নৃত্য। অসহ্য মনটা অনেকটা পথ ছুটে আকস্মিক থেমে পড়া কুকুরের মতো জিব বের করে হাঁপাচ্ছে। বদ্ধ করোটির ভেতোর লু হাওয়া বইছে। ধুলোধোঁয়া বাড়ছে চোখের সামনে। হৃদযন্ত্র নামের রক্ত পাম্পিংয়ের মেশিনটার কার্যক্রম দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। আওয়াজ ঠেকছে কানের পর্দায়।

কি হলো জলদি করুন। মেয়েটি আর সময় দিতে চাইছে না।
জোহান নিজেকে বোঝায়, নিয়ে যাক টাকা পয়সা, জিনিসপত্র। কেলেঙ্কারী বাড়ানোর চাইতে সব দিয়ে দেয়াই ভালো হবে। আর তাছাড়া মেয়েটার সাথে ভয়ঙ্কর সব ছিনতায়ি-খুনীদের সম্পর্ক আছে। জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও এখানে মুখ্য। জোহান মানি-ব্যাগ ঝেরে-মুছে চার হাজার তিনশত সাতান্ন টাকা, সেই সঙ্গে হাতের দামী ঘড়ি, গলার দেড়ভরি ওজনের চেইন আর মোবাইল সেটটি মেয়েটির সামনে বাড়িয়ে ধরে বলে, আর কিছু নেই।
মেয়েটি মুচকি হেসে বলে, চলবে।
উঠে দাঁড়ালো দাঁড়ালো সে। তারপর বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো, এখন এটা আমার নেশা বলতে পারেন, পেশাও বলতে পারেন। অভাবি ঘরের মেয়ে ছিলাম। কলুষমুক্ত শরীর ছিলো। সুন্দর মন ছিলো। চাকরি দিয়ে অফিসে সুযোগ বুঝে দেহ ভোগ করলো এক অবস্থাসম্পন্ন নিকটাত্মীয়। ঘৃণা, ক্ষোভ ও রাগে 'অবলা' নামের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। অফিসপাড়ার পুরুষদের ঘর ভাঙ্গার প্রচেষ্টা আমার নেশায় পরিণত হলো; আর ছলে-বলে কৌশলে অথবা ব্লাকমেইল করে অর্থ উপার্জনকে বেছে নিলাম পেশা হিসেবে। এখন বেশ আছি। মনে অনেক প্রশ্ন তাই না, আমি কেমন করে আপনাকে শিকার হিসেবে বেছে নিলাম? উত্তর খুব সোজা, বেশ ক'দিন ধরে আপনার এ-টু জেড খোঁজ-খবর নিয়ে তবেই আজ এসেছি। একটু থেমে ফিক করে হেসে মেয়েটি বললো, আশা করি খুব শিগগিরই আপনার ঘরটাও ভাঙ্গবে। আর ঘর না ভাঙ্গলেও অশান্তির মশালটা নিশ্চয় জ্বালাতে পেরেছি? বাই।
একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে জোহানকে নিক্ষেপ করে পেন্সিল সু'র টুক টাক শব্দ তুলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো মেয়েটি।
জোহান নির্বাক, নিথর। ■

// গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে ইনকিলাব ভবন থেকে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পূর্ণিমার ঈদ সংখ্যায়। পরবর্তিতে তা স্থান পায় মিজান পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের 'সেরা গল্প' গ্রন্থটিতে। //

প্রতিপক্ষ আগুন

'রিকশা নিয়ে জঙ্গি মিছিলের সামনে পড়াটা তোর ঠিক হয়নি রে নিজাম। আমরা এই মিছিল করছি কাদের জন্য, কাদের মুক্তির লক্ষ্যে? তোদের জন্য, বুঝলি, তোদের জন্য।.....

গল্প-চার

পীরগাছার হাট ভেঙ্গে গেছে। হাটুরেরা ঘরে ফিরছে। ছোট ছোট দলে। মুখে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর নাভিশ্বাসের ক্ষোভ। গ্রামীণ জনপদে সদ্য নেমে আসা রাতের কালো শরীরে ছড়ায় আশাহত মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

জনাসাতেকের ছোট একটি দলের সাথে ঘরে ফিরছে নিজাম। দলের সকলের মুখ চালাচালি করছে তপ্ত শব্দমালা। শুধু নিজাম নীরব। অন্তরে জ্বালা। নিজাম পথ ভাঙ্গছে নিঃশব্দে। রেলের পাথুরে পথ। নরম পায়ের সাথে ঠোকাঠুকি খায় কঠিন পাথর। খালি পা। তথাপি ব্যাথাবোধ হয় না ওর। কেননা মনের ভেতোর এর চাইতেও কঠিন পাথর ভাঙ্গছে এক নিষ্ঠুর হাতুড়ি। বড্ড যন্ত্রণা সেখানে। মুখাবয়বে বেদনার ছাপ। দিনের আলো থাকলে দু'চোখে দেখা যেতো চিকচিকে অশ্রু।

পথ ভাঙ্গছে নিজামদের ছোট দলটা। খানিকটা পরপর ওঠানামা করছে জলিল সর্দারের বিড়ির আগুন। মুখের কাছে গিয়ে উঠে জ্বলে উঠছে দ্বিগুণ তেজে। বাতাস পায় পোড়া তামাকের স্বাদ। দলের কারো কারো হাতে বাজারের ব্যাগ। হৃষ্টপুষ্ট নয়। তলানিতে কিছু আনাজ। ছটাক লংকা। কারো ব্যাগে সের আধেক চাল। বশিরের হাতে ধরা দড়িতে গলা বাঁধা বোতলে দোল খাচ্ছে আধাপোয়া কেরোসিন। কদম আলীর বগলদাবা ভাঁজ করা শূন্য ব্যাগটা হতাশা ছড়ায়।

'পিয়াজের দাম আটচল্লিশ টাকা! শালার পোড়া চোউখ দুইটা দিয়া আরও যে কতো কী দেখিম।' ফোঁস করে ওঠে আমজাদ আলী।

সুর মেলায় কছিরউদ্দিন, 'চাউল-ডাউল, নুন-আকালি, কেরাসিন, কোন্ জিনিসটার দাম কম বাহে! কিনবার গেইলে দম বাইর হয়া যায়।'

গজরায় চিনু সর্দার, 'ভাতের খোয়াব দেখায়া সবাই ভোট চায়। কিন্তু ভোট শ্যাষে তোর আর মোর খবর থাকে না।'

'দ্যাশটার যে দিন দিন কী হবান নাগছে! যেটেই হাত দেও স্যাটেই আগুন! শান্তি নাই!' ঝাঁঝালো কণ্ঠ মতি মিয়ার।

'দুই গণ্ডা পুঁটি মাছ, ব্যাঙাচির মতোন! কানি বইগলার আদার। দাম চায় দশ টাকা!' ক্ষোভ ঝরে পড়ে আমজাদ আলীর কণ্ঠে। জ্বলে ওঠে ঢিলে চামড়ার মানুষটার অভিজ্ঞতাপুষ্ট চোখ দুটো।

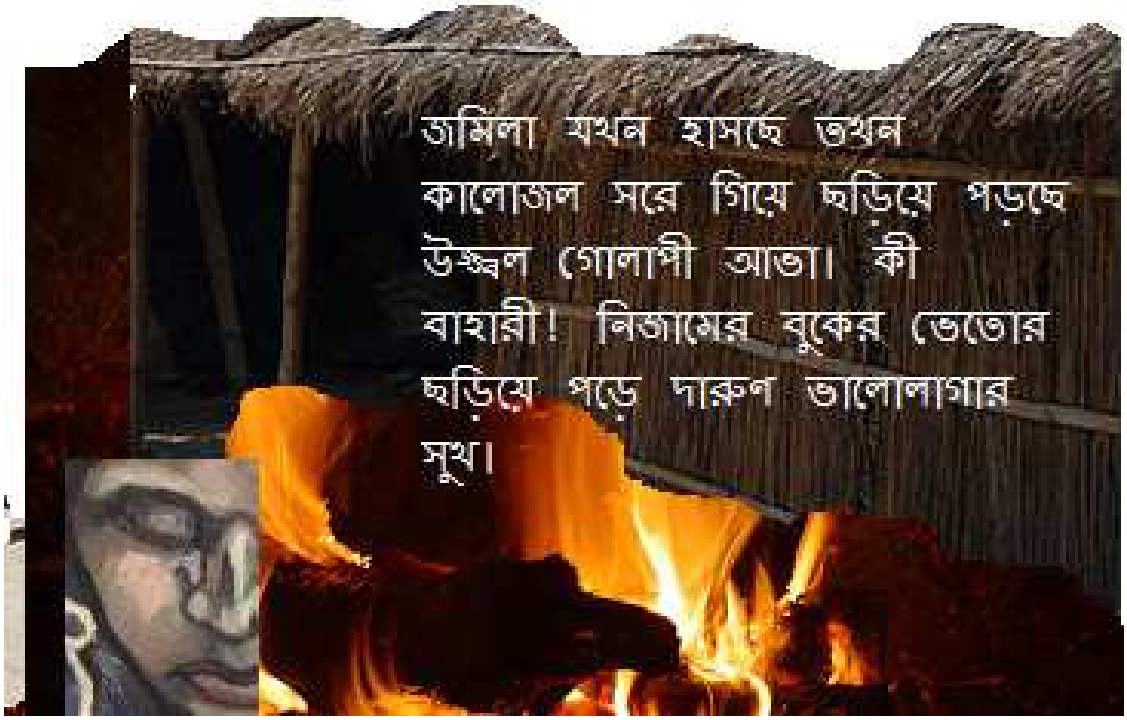

রাতের কালো শরীরে নিজামদের ছোট দলটি নিজেদের দুর্দশার বিষ ঢালে। নিজাম ছাড়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। মুখে কোনো কথা নেই। তবে ছলছলে চোখের সামনের কালো সরোবরে ও দেখে জমিলার পদ্মমুখ। সে কী মায়াভরা! জমিলা যখন হাসছে তখন কালোজল সরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উজ্জ্বল গোলাপী আভা। কী বাহারী! নিজামের বুকের ভেতোর ছড়িয়ে পড়ে দারুণ ভালোলাগার সুখ। কিন্তু নিজের দুর্দশার কথা যখন ভাবে, মুহূর্তের মধ্যে সে সুখ মরে যায়। নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বালা করে বুকের ভেতোরটা। নিজাম। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের হালকা পাতলা এক যুবক। শক্ত পায়ে সারাদিন রিকশার প্যাডেল মারে। রিকশার চাকা ঘোরে ওর শরীর থেকে ঝরে পড়া ঘামে ভেজা পথে। রিকশার প্যাডেল মেরেই নিজের ও জমিলার জীবনের চাকা সচল রেখেছে সে। সারাদিন রিকশা চালায়। যা আয় হয় তা দিয়ে চাল-ডাল কেনে। কোনোদিন জমিলার জন্য কিছু আলগা খাবার, খান দুই রসগোল্লা, কোনোদিন জিলেপি। কামাই বেশি হলে সাবান, স্নো কিংবা ফুরিয়ে যাওয়া পাউডার। নয়তো সস্তা দামের শাড়ি। জমিলাকে কিছু কিনে দিতে পারলে কী যে খুশী হয় নিজাম! মনটা বনে যায় ফুর্তিবাজ ঘোড়া। ছোটে পরম আনন্দে নরম জমিন ছুঁয়ে। জমিলাও ভীষণ খুশি হয়। নিজেকে সে সঁপে দেয় নিজামের শক্ত বাহুতে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিশফিশ করে বলে, ‘আপনে মানুষটা খুব ভালা।’

রিকশার প্যাডেলের সাথে বেশ চলছিলো নিজাম ও জমিলার জীবনের চাকা। কিন্তু হঠাৎ করে থমকে গেলো সে চাকা। বিশ-বাইশদিন আগের কথা। একটা খ্যাপ নামিয়ে খালি রিকশা নিয়ে ফিরছিলো নিজাম। এ সময় চমকে উঠে দেখলো, শ্লোগানে মুখর ছাত্রদের একটা মিছিল এগিয়ে আসছে পীরগাছা রেল স্টেশন ডিঙ্গিয়ে কলেজ রোড দিয়ে। নিজাম রিকশাটাকে রাস্তার একপাশে টেনে নিয়ে মিছিলের পথ করে দিলো। কিন্তু মিছিলটা কাছে এসে বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ করলো। ভাঙ্গলো গোটা কয়েক দোকানের আসবাব। তছনছ করলো। কেউ কেউ লুটলো দোকানের জিনিসপত্তর। একদল অতি উৎসাহী ছাত্র ভেঙ্গেচুরে জ্বালিয়ে দিলো ওর আর জমিলার জীবনের বাহনটা। হাতে ধরে, পায়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদলো নিজাম। কিন্তু ছাত্রদের সেকী তান্ডব, সেকী উৎসাহ! যেনো নিজামের রিকশাটা নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে জনগণের মুক্তি মিলবে না। দেশে গণতন্ত্র আসবে না। দুমড়ানো রিকশাটার হুড পুড়লো, সিট পুড়লো নিজামের চোখের সামনে। টায়ার পোড়ার গন্ধ ওর বুকের গভীরে পৌঁছালো। সামনে যা পেলো আরও কিছু ভাংচুর করে মিছিলটা ঢুকলো কলেজে। নিজাম আছড়ে পড়লো পথের বুকে। সে দেখেছে, মিছিলের সামনে ছিলো কোব্বাত স্যার। কলেজের শিক্ষক। পথ থেকে উঠে ছুটলো কলেজে। কোব্বাত স্যার ওকে খুব ভালো চেনেন। ওর রিকশায় চেপেছেন অনেকদিন। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ও ছুটে গিয়ে কোব্বাত স্যারের পায়ে পড়লো। স্যার তখন মিছিল শেষে ছাত্র সমাবেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছিলেন।

‘সার, মোর রিকশাটা মোকে ফেরৎ দ্যান সার। তোমার ছাত্ররা মোর রিকশটা পুড়ি দিছে। এলা মুই চলিম কেমন করি? মোকে বাঁচান সার।’

‘সার, মোর রিকশাটা মোকে ফেরৎ দ্যান সার। তোমার ছাত্ররা মোর রিকশটা পুড়ি দিছে। এলা মুই চলিম কেমন করি? মোকে বাঁচান সার।’ ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো নিজাম। কোব্বাত স্যার জ্বালাময়ী ভাষণ থামালেন। নিজামের মাথায় নরম হাতে মমত্ব ছড়ালেন। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, ‘রিকশা নিয়ে জঙ্গি মিছিলের সামনে পড়াটা তোর ঠিক হয়নি রে নিজাম। আমরা এই মিছিল করছি কাদের জন্য, কাদের মুক্তির লক্ষ্যে? তোদের জন্য, বুঝলি, তোদের জন্য। তোদের মতো গরীব জনগণের জন্য।’ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের একজন নিজামকে ধমক দিলো, ‘স্যারকে এখন বিরক্ত করিস না, ভাগ।’ স্যার নরম সুরে বললেন, ‘আজ যা, কাল একবার বাড়ি আসিস, দেখি তোর জন্য কি করা যায়।’

ছিন্ন-ভিন্ন বুকে নিজাম ঘরে ফিরলো বেলা পশ্চিমে হেলে পড়ার আগেই। বিধ্বস্থ নিজামকে অসময়ে ফিরতে দেখে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে জমিলার কণ্ঠে, ‘কি হইছে! তোমাক এমন নাগবেন নাগছে ক্যান?’

নিজাম ডুকরে কেঁদে বললো,‘জমিলারে মোর সউগ শ্যাষ হয়া গেইছে, রিকশাটা পুড়ি ছারখার করি দিছে ছাত্ররা।’

পাথর বনে গেলো জমিলা। একি শুনছে সে! এ কেমন কথা!

কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীর কাছে পাঁজরভাঙ্গা ঘটনার বর্ণনা দিলো নিজাম। সব শুনে জমিলাও ডুকরে কেঁদে উঠলো। জড়ো হলো প্রতিবেশীরা। কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করলো, কেউ সমবেদনা। এ ছাড়া আর কিইবা করার আছে তাদের।

হাঁটতে হাঁটতে আমজাদ আলী প্রশ্ন করলো, ‘কিরে নিজাম, তোর রিকশাটার কোনো গতি হইল্?’

নিজামের বুকের পাঁজর ভাঙ্গে। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সে', মনে হয় মোর রিকশাটা আর মুই ফিরি পাবাননোম চাচমিয়া।'

'কইস কী!' আমজাদ আলী থমকে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, 'তা হইলে তুই বাচপু কেমন করি? নিজে কী খাবু, আর বউটাকই বা কী খাওয়াবু!'

নিজাম হতাশার কণ্ঠে বলে, সেইটাই তো এলা চিন্তা করবেন নাকছোম চাচমিয়া'।

'ক্যান্, মাস্টোরের ব্যাটার কাছে যাইস নাই?' মতি মিয়া প্রশ্ন করে।

'গেছনু।' নিজাম বলে, নিত্যদিনই তো যাবান নাকছোম। আইজকা সাফ সাফ কয়া দিছে, তায় ইলিকশনে জিতলে মোক একটা নয়া রিকশা কিনি দেবে।'

'তদ্দিন তুই বাচি থাকবুরে তো নিজাম?' প্রশ্ন করে বশির।

উত্তর দেয় না নিজাম। ক'দিন থেকে কামাই রোজগার নেই। তাতেই ওর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। চুলোয় হাঁড়ি চাপছে না নিয়মিত। ও দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ। মাত্র তো কয়টা দিন; এতেই কঠিন অভাব দাঁত বসিয়েছে জমিলার সুন্দর মনটাতে। ওর মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গেছে। নিজামের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা যেনো শুকিয়ে গেছে। বুক জুড়ে পড়েছে তিস্তা নদীর চর। আজ সকালে খিদের জ্বালায় তিরিক্ষি মেজাজে জমিলা বলেছে, 'আর কয়দিন না খায়া থাকিম, ভাত দিবার পারবেন নন তো ভাতার হইছেন ক্যান?' জমিলার কথাগুলো নিজামের মনটাকে দারুণভাবে আহত করে। সে ভাবে, অভাব কতো সহজে ভালোবাসাকে খুবলে খুবলে খায়। ক'দিনেই জমিলা কেমন বদলে গেছে! অথচ যখন ওর রিকশটা ছিলো, নিয়মিত চুলোয় হাঁড়ি চড়তো। বাজার থেকে রসগোল্লা, জিলেপি আনতো তখন জমিলা ওকে কতোই না আদর-সোহাগ করতো। ওর জন্য জমিলার পরাণটা কতোই না পুড়তো। কিন্তু আজ নিজাম বেকার। আয় রোজগার নেই, তাই জমিলার আদর সোহাগের মনটাও মরে গেছে।

টানা বিশ-বাইশ দিন কোব্বাত স্যারের পেছনে ঘুরছে নিজাম। আজ না, কাল আসিস, কাল না পরশু আসিস এভাবে চড়কির মতো ঘুরিয়েছে লোকটা ওকে। কিন্তু আজ সকালে বলে দিয়েছে সাফ কথা। বলেছেন, 'কেনো তুই ওভাবে জঙ্গী মিছিলের সামনে পড়তে গেলি বাপু! আরে বাবা আমরা তো তোদের জন্যই মিছিল করছি। শ্লোগানে শ্লোগানে গলা ফাটাচ্ছি। ডালে-ভাতে তোরা সুখে থাকবি এটাই তো আমাদের লক্ষ্য। তোর একটা রিকশা গেছে এটা বড় কথা নয়, দেশের মানুষের সুখ-শান্তিই হচ্ছে বড় কথা। দেশের কল্যাণের জন্য, জনগণের সুখের জন্য অনেক কিছুই

কোরবানী দিতে হয়। এই যেমন তুই তোর রিকশাটা দিলি।' নিজাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছে, 'কিন্তু মুই এলা বাঁচিম কেমন করি সার? কি করিম, কি খাইম?'
ঝানু রাজনৈতিক শিক্ষক কোব্বাত স্যার কণ্ঠে দরদ এনে বলেছেন, 'দেখ চেষ্টা তদবির করে, কিছু একটা করতে পারিস কি না। তবে এই তোকে কথা দিলাম, এবার ইলেকশনে জিততে পারলে তোকে এক্কেবারে ঝকঝকা নয়া একটা রিকশা কিনে দেবো।'
প্রশ্ন করেছে নিজাম, 'ইলিকশন কোন্ দিন হইবে সার?'
কোব্বাত স্যার উত্তর দিয়েছেন, 'সেজন্যই তো এই মিছিল মিটিং করছি, খুব শিগগিরই হবে।'
বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরেছে নিজাম।
পীরগাছা থানা সদরটা বেশ ছোট। রিকশা চলে গোটা কতক। এসব রিকশা মালিকরাই চালক। ভাড়ায় কেউ রিকশা দেয় না। আজ সারাটা দিন দানাপানি পেটে পড়েনি নিজামের। জমিলাও উপোস। সারাদিন বাজারে এ মহাজনের গদি, সে মহাজনের দোকান করেছে, কাজ জোটাতে পারেনি। আজ ছিলো হাটবার। মানুষ কতো কিছু বেচাকেনা করলো কিন্তু নিজাম কিছু বেচতেও পারলো না, কিনতেও পারলো না। ওর চোখের সামনে দোকানি গরম জিলেপি ভেজে ভেজে বিক্রি করলো। বুকভাঙ্গা দুঃখ নিয়ে টলটলে চোখে রসভরা গরম জিলেপির দিকে তাকিয়ে থাকলো আর ভাবলো, 'ইস এটে থাকি গোটা কয় জিলেপি জমিলার জন্যে নিবার পারলে জমিলা খুব খুশি হইল্ হয়।' চাল-ডাল, তেল-লবণ সব কিছুর উপর নজর ফেললো নিজাম আর মনের ভেতোরে চললো রক্তরক্ষণ। ফুটো পয়সাও নেই হাতে। কিছুই কিনতে পারলো না সে। সাঁঝের আঁধার নামলো। রাত হলো। এক সময় হাট ভাঙ্গলো। হাটুরেরা বাড়ি ফিরতে শুরু করলো। শূন্য হাতে বুকভরা কান্না নিয়ে বাড়ির পথে নিজামও পা বাড়ালো।

যেতে যেতে ওদের দলটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। যার বাড়ি আগে পড়ছে সেই কমে যাচ্ছে। এক সময় নিজাম একা হয়ে গেলো। একটু খাবার জোটাতে না পারার ব্যর্থতায় ওর হৃদয়টা দলিত-মথিত হচ্ছে। সারাটা দিন জমিলাও না খেয়ে আছে। ভাবে নিজাম, 'কী করে এখন গিয়ে সে জমিলার সামনে দাঁড়াবে?' বুক ঠেলে ওর উঠে আসে কান্না। রেল লাইনের ওপর বসে সত্যিই কাঁদতে শুরু করে। হু হু করে কাঁদে। কেঁদে কেঁদে বুকটাকে হালকা করতে চায়, কিন্তু পোড়া বুক হালকা হয় না। ভেজা কণ্ঠে আপন মনে বিড়বিড় করে নিজেকে প্রশ্ন করে, 'জমিলার পদ্মমুখখান দিন দিন কেমন শুকি যাবান লাগছে, এমন করি না খায়া থাকলে কয়দিন বাচপে জমিলা?' জমিলার জন্য ওর মায়া বাড়ে, সাথে কান্নার বেগ আরো বাড়ে। চোখের পানিতে ভেজে রেলের পাত-পাথর। রেলপথ ধরে হাটুরেরা আসছে, চলে যাচ্ছে ওকে পেরিয়ে। হাতের পিঠে চোখ মুছে অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালো নিজাম। কষ্টে ভারী পা দুটো টেনে টেনে চললো বাড়ির পথে। বাড়ি বলতে দু'টো কুঁড়েঘর। একটা থাকার আর একটা রান্নার। শুকনো কলাপাতায় ঘেরা ছোট্ট উঠোন। উঠোনে পা রেখেই চমকে ওঠে নিজাম, রান্না ঘরে আলো জ্বলছে! গোটা বাড়ি ভরে আছে মাংসের গন্ধে! ও দ্রুত পা চালিয়ে রান্না ঘরের প্রবেশমুখেই থমকে দাঁড়ায়, চুলোর পাশে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দপদপ করে জ্বলছে বড় কুপিটা। তেলের অভাবে বিশ-বাইশ দিন জ্বলেনি ওটা। এখন তেল পড়েছে জ্বালাময়ী পেটে, মনের সুখে বেশ জ্বলছে। চুলোয় হাঁড়িতে মাংসের ঝোল ফুটছে জিবে পানি তোলা গন্ধ ছড়িয়ে। সামনে বসে আছে জমিলা। কুপি আর চুলোর উজ্জ্বল আলোতে জমিলার মুখ সতেজ দেখাচ্ছে, আর জমিলার পাশে একটা উঁচু টুলে বসে আছে ওদের গ্রামেরই তাগড়া জোয়ান রমিজউদ্দিন। পীরগাছা বাজারে ওর দুটো বড় দোকান আছে।

চুলোর পাশে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দপদপ করে জ্বলছে বড় কুপিটা। তেলের অভাবে বিশ-বাইশ দিন জ্বলেনি ওটা। এখন তেল পড়েছে জ্বালাময়ী পেটে, মনের সুখে বেশ জ্বলছে। চুলোয় হাঁড়িতে মাংসের ঝোল ফুটছে জিবে পানি তোলা গন্ধ ছড়িয়ে। সামনে বসে আছে জমিলা।

নিজামকে দেখে এক গাল হেসে রমিজউদ্দিন বলে, 'তুই কোনো চিন্তা করিস না নিজাম, মুই থাকতে তোর আর জমিলার একনাও ক্ষতি হবান নয়।'

নিজাম তাকালো জমিলার দিকে। বেশ চকচক করছে জমিলার চোখ-মুখ।

মুচকি হেসে জমিলা বললো, 'রমিজ ভাই কইছে, আপনেক্ তার দোকানে রাখবে। ম্যালা টাকা বেতন দেবে।'

জমিলার কথাগুলো নিজামের কানে ঢুকলো না। ও কল্পনার চোখে দেখছে, ছাত্রদের পুড়িয়ে দেয়া রিকশাটার মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে জমিলা। রিকশটার হুড, টায়ার, সিট পোড়ার মতো পুড়ছে জমিলার ঠোঁট, বুক, শরীর। জমিলার শরীর পোড়ার গন্ধ ওর বুকের গভীরে পৌঁছালো। ঠিক রিকশাটার টায়ার পোড়ার গন্ধের মতো।

নিজামের বুক ঠেলে আবার উঠে আসে বাঁধভাঙ্গা কান্না। ■

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের ঈদ সংখ্যায়। পরবর্তিতে তা স্থান পায় বিশ্ব সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত লেখকের 'গল্পসমগ্র' গ্রন্থটিতে। ॥

লেখকের কিছু বই

গুডনাইট টুনি, নির্বাচিত গল্পসমগ্র, পরবাসে প্রায়শ্চিত্য, বড় কষ্ট লাগে, যুবক এবং যন্ত্রণা, রূমকি, শুধু তোর জন্য, রিতুর জন্য কষ্ট, দশ নম্বরের ফাউল, নীরবে নিঃশব্দে, এখন প্রয়োজন আকাশের সান্নিধ্য, বেষ্ট অব ক্রীড়ালোক, তরুণী শীলার খোলা চিঠি, শনিবারের ম্যাচ...

আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ। ভাসছে ধরণী জ্যোৎস্নার প্লাবনে। থেকে থেকে নষ্ট মেঘ কোথা থেকে ছুটে এসে চড়াও হচ্ছে চাঁদটার ওপর। সেই কলঙ্ক ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘাস, মাটি, ধানি জমি, লাউ-পুঁইয়ের ডগা, ঝাঁকরা মাথার বৃক্ষরাজি। সেই কলঙ্ক স্পর্শ করে ঘুমটির ঢালুতে হাজারকির কুঁড়েঘরটাকেও.....

হা জা র কি

গল্প-পাঁচ

রেল লাইনের ঢালু পথ ধরে হেঁটে চলেছে হাজারকি। পরনে লাল পেড়ে বাসন্তী রঙের শাড়ি। জড়িয়েছে এক প্যাঁচে। পায়ে সবুজ ফিতের সাদা স্পঞ্জ। লম্বা একহারা গড়ন। শরীর জুড়ে ভরা নদীর চমক। কান পাতলেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে আঘাত করে খ্যাপা স্রোতের কলকল ধ্বনি। পিয়াসি পুরুষের বুকের ভেতোর জাগে ঢেঁকির ধাপুর-ধুপুর শব্দ। হাজারকির দেহের খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে ভাঁজে চোখ ফেলে লালা ঝরে ভ্রমরকুলের। লোভাতুর জিহ্বায় ঠোঁট চাটে কামুকের দল। খাড়া নাক, টানা টানা হরিণ চোখ, তাম্বুলের রসে রাঙ্গানো পাতলা ঠোঁট। সব মিলিয়ে হাজারকি দারুণ ভালো লাগার মতো একটি কবিতা যেনো।

আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ। ভাসছে ধরণী জ্যোৎস্নার প্লাবনে। থেকে থেকে নষ্ট মেঘ কোথা থেকে ছুটে এসে চড়াও হচ্ছে চাঁদটার ওপর। সেই কলঙ্ক ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘাস, মাটি, ধানি জমি, লাউ-পুঁইয়ের ডগা, ঝাঁকরা মাথার বৃক্ষরাজি। সেই কলঙ্ক স্পর্শ করে ঘুমটির ঢালুতে হাজারকির কুঁড়েঘরটাকেও। ফাঁক-ফোকর গলে ছড়িয়ে পড়ে তেল চিটচিটে কাঁথা, বালিশ পাতা বিছানার ওপর। কিছুক্ষণ। তবে বড় বেশি যন্ত্রণা! বড় বেশি কষ্ট! নষ্ট মেঘ সরে গেলেই আবার হেসে ওঠে পূর্ণ শশী। জ্যোৎস্নালোকে আবার থইথই করে পৃথিবী। ঐ চাঁদটার সাথে হাজারকির দারুণ মিল। চাঁদের মতোই রূপবতী হাজারকির কোনো পতি নেই। মেঘেরা আসে নাগর সেজে। দলিত-মথিত করে ফিরে যায়। বড় কষ্ট! বড় যন্ত্রণা! জীবনের প্রয়োজনে আবার হেসে ওঠে হাজারকি। ও করুণ চোখে তাকায় চাঁদটার দিকে। বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

হাজারকি এগিয়ে চলছে ঘুমটির ঢালুতে ওর কুঁড়েঘরটার দিকে। ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। সামনে শুকনো কলাপাতায় ঘেরা এক চিলতে উঠোন। কুঁড়েঘর আর ওঠোনটা জড়াজড়ি করে রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে। আঁধারে ডোবে, আবার জ্যোৎস্নায় ভাসে। ঘরে আছে বুড়ি মা। আর কেউ নেই ওর দুনিয়াতে। হাজারকির গতর বেচা টাকায় চলে সংসার। চোখে ছানি পড়া বুড়ি মা আহার গেলে কেঁদে কেটে। বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায় তার। কিন্তু এছাড়া যে আজ আর খোলা নেই মা ও মেয়ের উদোরপূর্তির কোনো পথ। বুড়ি ছমিরন বিবি সব জানে, সব দেখে। তবুও অসাড় হয়ে পড়ে থাকে নির্মম বাস্তবতার কষাঘাতে। শীর্ণ হাত তুলে প্রার্থনায় খোঁজে শুধু মুক্তির পথ। তার বক্ষমথিত বেদনার শ্বাসে কাঁপে কুঁড়েঘরটা। সহমর্মিতা জানায় উঠোন ঘেরা শুকনো কলাপাতা।

‘প্রাণ থেকে যদি দেহটা আলাদা করে বেঁচে থাকা যেতো, তবে কবেই সে ছুড়ে ফেলতো সর্বনাশী দেহটা.....’

মন বিষন্ন, হতাশায় জর্জরিত, তথাপি হাজারকি পথ ভাঙ্গছে দমকে, ঠমকে। একটা দমকা বাতাস এলোমেলো করে দিলো ওর ঘন-কালো চুল। চলতে চলতে দু’হাতে চুলগুলোকে খোঁপায় বাঁধলো সে। বিশুদ্ধ ঠান্ডা বাতাসে প্রশান্তি অনুভব করলো। চলার গতিটা একটু বাড়লো ওর। আর খুব বেশি দূরে নয় ঠিকানা।

-কে যায় ওটা, হাজারকি নাকি? পশ্চিমের শিমুলতলা থেকে ভেসে আসে পুরুষের কণ্ঠ।

হাজারকি থমকায় না। চমকায় না। কোনো উত্তরও দেয় না। হাঁটতে থাকে নীরবে।

-আরে কথা কয় না ক্যান! কে যায়? আবার ভেসে আসে পুরুষ কণ্ঠটা।

হাজারকি বড্ড বিরক্তিবোধ করে। একটু থামে। তারপর গলা চড়িয়ে বলে, তর মায়ে যায়।

-শালী, আস্ত একটা হারামির বাচ্চা! খিস্তি শোনা গেলো শিমুলতলায়।

একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো হাজারকির ঠোঁটে। শিমুলতলা থেকে ছায়াটা সরে গেলো। কিন্তু সামনে কিছুটা পথ ভাঙ্গতেই মুখোমুখি হলো সে করিম মেম্বারের। সাথে জনাকয়েক সঙ্গী।

-কিরে, হাজারকি নাকি, কেমন আছিস? করিম মেম্বারের কণ্ঠে আন্তরিকতা ঝরে পড়লো। হাজারকি কোনো উত্তর দিলো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো।

-কিরে উত্তর দ্যাস না ক্যান! বোবা হইলি নাকি? এবার খেঁকিয়ে ওঠে করিম মেম্বার।

-মেম্বার সাব, এই বাজারি মাইয়াডার লগে প্যাঁচাল পাইরা কাম নাই। চলেন, শালিশের সময় গড়াইয়া যাইতাছে। মেম্বারের সঙ্গীদের একজন বললো।

হাজারকি লোকটার কথা গায়ে না মেখে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে বলে, আবার কার সালিশ করতে চললেন মেম্বার সাব? ওর ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি।

করিম মেম্বারের দৃষ্টি এড়ায় না হাসিটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সে জ্যোৎস্নামাখা হাজারকির মুখটার ওপর। বলে, গতরে তো বেশ ত্যাল হইছে দ্যাখতাছি! কই যাই, কার সালিশ করি, এইসব কি তরে কইতে হইবো নাকি? যত্তোসব, এই চল। ওকে পাশ কাটিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে সামনে পা বাড়ালো করিম মেম্বার।

মনের যতো ঘৃণা আর ক্ষোভ মিলিয়ে পেছন ফিরে একদলা থুথু ফেলে হাজারকি উচ্চারণ করে, কুত্তার বাচ্চা।

ওর সে উচ্চারণ করিম মেম্বারের শ্রবণেন্দ্রিয় পর্যন্ত না পৌঁছালেও নীরব রাতের বাতাসকে কাঁপিয়ে দেয়।

হাজারকি পা ফেলে সামনের দিকে তবে কেমন যেনো আনমনা হয়ে যায়। আবার একখন্ড মেঘ চাঁদের বুকে চেপে বসেছে। আপন কুঁড়েঘরটার সামনে এসে বুক ভরে শ্বাস নেয় সে। বড় ভালো লাগে। নিজেকে বেশ হালকা মনে হয়। ঘরে ঢুকে দেখলো, মা জেগে আছে। ভাঙ্গা হারিকেনটার স্বল্পপ্রাণ আলোতে মায়ের চোখের ব্যাকুলতা ওর হৃদয়ের গভীর স্পর্শ করে।

-মা, তুই অহনো ঘুমাস নাই! হাজারকি মায়ের মাথায় হাত রাখে।

-না, মা।

-তরে না কইছি খাইয়া-দাইয়া ঘুমায় পড়বি, আমার ফিরতে রাইত হইবো।

কোনো কথা বলে না ছমিরন বিবি। বোবা চোখে মেয়ের মুখ চষে ফেরে সে। হারিকেনের স্বল্প আলোতেও নজর এড়ায় না হাজারকির মায়ের চোখের ভাষা। ছানিপড়া চোখে মেয়ের মুখ নজরে আসে না; তবুও চষে ফেরে ছমিরন বিবি। মায়ের এ প্রবণতায় একটু বিরক্ত হয় হাজারকি। মায়ের পাশে বসে বলে, কি দেখবার জন্য তর পরানডা ছটফট করতাছে মা, কি দেখবার চাস তুই?

‘ছমিরন বিবির শীর্ণ হাত হাজারকির মুখ স্পর্শ করে। অনুভব করতে চায় কতো কলঙ্কের দাগ জমা পড়েছে মুখটায়। হাজারকি সরিয়ে দেয় মায়ের হাতটা....’

ছমিরন বিবির শীর্ণ হাত ওর মুখ স্পর্শ করে। অনুভব করতে চায় কতো কলঙ্কের দাগ জমা পড়েছে মুখটায়। হাজারকি সরিয়ে দেয় মায়ের হাতটা। মাটির শানকিতে পাতিল থেকে ভাত-তরকারি তুলে নিয়ে খেতে বসে সে।

-মা, আর দুগা ভাত খাবি? মায়ের উদ্দেশে বলে।

-নারে মা, তুই খা। আমি খাইছি। ছমিরন বিবি উত্তর দেয়।

হাজারকি তবুও শানকিটা হাতে করে উঠে যায় মায়ের পাশে। বলে, নে মা, দুই গাল খা। ছমিরন বিবির দু'চোখ ভরে যায় পানিতে। হাজারকি মায়ের মুখে তুলে দেয় একগাল ভাত। মাকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে মায়ের শীর্ণ দেহটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে । মায়ের শরীরের স্পর্শ ওর শরীরটার ভেতোর ছড়িয়ে দেয় এক স্বর্গীয় অনুভূতি। বুকের মাঝে বড় সুখ অনুভব করে সে। বড় প্রশান্তি! মায়ের এই সান্নিধ্যটুকুর বাইরে ওর জীবনে এখন আর সবই অশান্তিময়। যন্ত্রণাদায়ক! অসহ্য! ঘুম আসে না হাজারকির। ভাঙ্গা হারিকেনের স্বল্প আলোতে মুখভাবে একটা পরিবর্তন আসতে থাকে ধীরে ধীরে। ঘুমন্ত মায়ের মাথার ওপর দিয়ে চোখ দুটো স্থির হয় বাঁশের খুটিতে ঝুলে থাকা হারিকেনের মিটিমিটি আলোর ওপর। ওর তীব্র ইচ্ছে জাগে ঐ আলোটুকুও নিভিয়ে ফেলতে।

নিজের দেহটার প্রতি বড় ঘেন্না হাজারকির। প্রাণ থেকে যদি দেহটা আলাদা করে বেঁচে থাকা যেতো, তবে কবেই সে ছুড়ে ফেলতো সর্বনাশী দেহটা। হ্যাঁ, ওর দেহটাই ওকে ঠেলে দিয়েছে সর্বনাশের পথে। দেহটার কারণেই আজ জীবন এতো যন্ত্রণাদগ্ধ।

কেউ নেই ওর দুনিয়াতে। হাজারকির গতর বেচা টাকায় চলে সংসার। চোখে ছানি পড়া বুড়ি মা আহার গেলে কেঁদে কেটে। বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায় তার।

হাজারকি এমন ছিলো না। হাজারকি ওর আসল নামও নয়। ওর নাম সেতারা। সহায়-সম্বলহীন বাবার অকাল মৃত্যুর পর অসহায় মা পরের বাড়িতে গতর খাটিয়ে ওকে বড় করেছে। মায়ের গতর খাটা আদার খেয়ে ফরফর করে বেড়ে উঠলো সেতারা। বারো পেরিয়ে তেরো, এরপর চৌদ্দ। শুরু হলো চারপাশে কামুক শকুনের ভিড়। সেতারার গতর বাড়ে, খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে ভাঁজে নজর কাড়ে। নবযৌবনের মৌ মৌ গন্ধে ছোটে ভ্রমরকুল। নানা ছলে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বলে। কতোজন কতো কায়দায় জাল পাতে কিন্তু সেতারা ধরা দেয় না। নানা কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে জল কেটে চলে। তবে একদিন সত্যি সত্যি আটকে গেলে কোব্বাত মুন্সীর ছেলে বশিরের জালে। এদিকে ছমিরন বিবি মেয়ের জন্য একটি ভালো ছেলের সন্ধান করতে থাকে। একদিন তার পছন্দ হয় উঁচাপাড়ার নজির আলীর ছেলেকে। বাজারে দোকান আছে। কামাই রোজগার ভালো। নজির আলীর সাথে এ নিয়ে কথাও বললো ছমিরন বিবি। নজির আলী বলে, 'মাইয়া তোমার রূপবতী; আমার আপত্তি নাই।' উৎফুল্ল চিত্তে, আনন্দে গদগদ কণ্ঠে সু-সংবাদটা ছমিরন বিবি তুললো সেতারার কানে। কিন্তু ততোদিনে সেতারা সর্বনাশের পথ ধরে চলে গেছে অনেকদূর। বশিরের চলনে-বলনে, স্বপ্ন-সুখে শুধু আদর আর সোহাগ নয়, বশিরের বীজ নিয়েছে সে নিজের জমিনে। বীজ অংকুরিত হয়, ধীরে ধীরে মাথা তোলে। সব শুনে ছমিরন বিবি চিৎকার করে। বুক চাপড়ায়। ছুটে যায় বশিরের কাছে। বশির অস্বীকার করে। বলে, 'বড় তো আইছো আমার কাছে, মাইয়া তোমার কার লগে কি আকাম-কুকাম করছে অহন গছাইতে চাও আমার ঘাড়ে!' ছমিরন বিবি ছুটে যায় কোব্বাত মুন্সীর কাছে। সব শুনে 'নাউজুবিল্লাহ' পড়ে কোব্বাত মুন্সী বলে, পোলা আমার সোনার টুকরা। মেট্রিক পাস দিছে। কতো মাইয়ার বাপে ঘুরতাছে জামাই করোনের লাইগ্যা। পোলার এক কথা আইএ দিয়া বিয়া করমু। আমার এমুন ফেরেস পোলাডার নামে এইসব তুই কি কইতাছোস ছমিরন!

-ঠিক কইতাছি মুন্সীসাব। কাতর কণ্ঠে বলে ছমিরন বিবি।

আগুন ঝরে যেনো কোব্বাত মুন্সীর কণ্ঠ থেকে, আমার ফেরেস পোলার নামে বদনাম দিলে তোরে আমি খুন কইরা ফালামু।

শুরু হয় ছমিরন বিবির পাগলের মতো ছোটাছুটির পালা। গ্রামের ময়-মুরুব্বীদের দ্বারে দ্বারে মাথা কুটে বেড়ায় সে। অবশেষে সালিশ বসলো। চাপের মুখে দোষ স্বীকার করলো বশির।

কোব্বাত মুন্সীর সাথে কানে কানে শলা-পরামর্শ করে গ্রামের মাথা করিম মেম্বার এক হাজার টাকা জরিমানা করলো বশিরকে। বশির সমবেত গ্রামবাসীর সামনে এক হাজার টাকা সেতারার হাতে তুলে দিয়ে পুনর্বার ফেরেস হলো। আর এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে সেতারা পেলো ‘হাজারকি’ নাম, আর নষ্ট মেয়েমানুষের অপবাদটা। গ্রামের লোকজন এরপর থেকেই ওকে হাজারকি বলে ডাকতে লাগলো।

অসহায় ছমিরন বিবি দ্বারস্থ হলো হাশেম কবিরাজের। দক্ষ হাশেম কবিরাজ গাছ-গাছরার ঝাঁঝালো রস খাইয়ে হত্যা করলো হাজারকির ভেতরে বেড়ে ওঠা বিষবৃক্ষ। নষ্ট জীবন নিয়ে কষ্ট বেড়ে গেলো হাজারকির। বুকের গভীরে আজন্ম লালিত স্বপ্নটা ভেঙ্গে চুরে, দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেলো। নারী জীবনের সাধ-আহলাদ, চাওয়া-পাওয়া খ্যাপা ঝড়ের তান্ডবে দলিত-মথিত হতে থাকলো প্রতিনিয়ত।

কোব্বাত মুন্সীর ছেলে বশিরের পর ওর জীবনে সুখের নহর বইয়ে দেয়ার পাক্কা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলো বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক আলতাফ মিয়া। লোকটার স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় সেটা জানতো হাজারকি আর তার মা। আগেও দু'বার বিয়ে করেছিলো আলতাফ মিয়া। দারুণ অসুখী জোড়া বউ ঘর ছেড়েছে এক রাতে। আলতাফ মিয়ার চোখ পড়লো হাজারকির ওপর। সে গদগদ দরদমাখা কণ্ঠে ছমিরন বিবিকে বোঝালো, বুঝলা ছমিরন বিবি, তোমার মাইয়া নষ্টা। অমুন আধখাওয়া, পোড়া মাইয়ার লাইগ্যা ফেরেস পোলা পাইবা না। হের চাইতে ভালা, আমার হাতে তুইল্যা দাও। আদরে-সোহাগে, আহারে বিহারে তোমার অভাগী মাইয়ারে আমি সুখেই রাখুম। কথা দিলাম তিন কসম খাইয়া।

আলতাফ মিয়া ব্যবসায়ী মানুষ। কোন্ তালায় কোন্ চাবি ঢোকাতে হবে সেটা বেশ বোঝে। গ্রামের ময়-মুরুব্বীদেরও বাগিয়ে ফেললো। একেবারে কোণঠাসা হয়ে অবশেষে মাঘের এক কুয়াশাভেজা রাতে গ্রামের মুরুব্বীদের উপস্থিতিতে চাঁদমুখী মেয়েকে তুলে দিলো আলতাফ মিয়ার হাতে ছমিরন বিবি।

একমাস হাজারকির দেহটার ওপর চড়ে বেড়িয়ে খায়েস মিটলো আলতাফ মিয়ার। খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো এরপর আসল মানুষটা। একদিন ভাত দিতে দেরি হলো বলে হাত তুললো সে হাজারকির গায়ে। শুরু হলো নির্যাতনের পালা। আলতাফ মিয়ার নির্যাতন যতোই বাড়তে লাগলো নিজের জীবন ও দেহটার ওপরও হাজারকির ঘেন্না ততোই বাড়তে লাগলো। রাগে-দুঃখে, ক্ষোভে-অভিমানে নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করার পথে পা বাড়ালো সে। তিন মাসের মাথায় পরপুরুষকে ঘরে ডেকে নিয়ে 'বাজে কাজ' করার অপরাধ মাথায় নিয়ে আলতাফ মিয়ার ঘর ছাড়লো হাজারকি। ফিরে এলো ঘুমটির ঢালুতে মায়ের ছোট্ট কুঁড়েঘরটায়।

ঘরে বুড়ি মা, আর অভাব। নিজের এবং মায়ের পেটের দানা-পানি যোগাতে সে একদিন পরিণত হলো বাজারি মেয়েমানুষে। গতর বেচে চাল কেনে। নিজে খায়, মাকে খাওয়ায়। আর ক্ষত-বিক্ষত জীবন ও ব্যথা জর্জরিত শরীর নিয়ে পড়ে থাকে ছোট্ট কুঁড়েঘরটায়। বাজারের পথে পা বাড়ায় বিকেলে, ফেরে মাঝরাতে। কোনোদিন ভোররাতে। কখনো কখনো ন'টা, দশটায়।

আজ একটু আগেভাগেই ফিরেছে হাজারকি। যায়নি কোনো চাতালে, মহাজনের গদি কিংবা কোনো ছাত্র মেসে। মনটা সকাল থেকেই ভালো নেই। পাপের ভারে নুয়ে পড়া জীবনটাকে আর টানতে পারছে না সে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরায়। তরপায়। মায়ের শীর্ণ দেহটা জড়িয়ে ধরে অতীতকে রোমন্থন করে তেঁতো হয়ে যায় ওর মনটা। জীবন আর জগতকে এখন আর মোটেও ভালো লাগে না। পাপের রোজগারে কেনা ভাত এখন আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। রাতের আঁধারে বারো পুরুষের সাথে শুয়ে দিনের আলোতে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না। অনেক তো হলো। অনেক ঝড়ের তান্ডবে অনেক তো বিধ্বস্ত হলো সে, কিন্তু আর নয়। হাজারকির চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। কঠিন হয়ে গেলো মুখাবয়ব। এক সময় মায়ের সুখ আর প্রশান্তিময় শরীরটা ছেড়ে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

ঘুমিয়ে আছে বুড়ি মা ছমিরন বিবি। হারিকেনের আলো ফেলে মায়ের শুকনো মুখটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে। বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। এরপর এগিয়ে যায় ঘরের কোণে শিঁকেয় ঝোলানো মাটির পাতিলটার দিকে। ঐ পাতিলটার ভেতর সে দিনে দিনে গড়ে তুলেছে একটা ক্ষুদ্র সঞ্চয়। চাল-ডাল, আনাজ-পাতি কেনার পর এক টাকা, দু'টাকা, পাঁচ টাকা করে জমে উঠেছে বেশ কিছু টাকা। হাজারকি পাতিলের ভেতর থেকে টাকাগুলো বের করে ঘুমন্ত মায়ের মাথার কাছে রেখে ফিসফিস করে উচ্চারণ করে, 'জানি, এই কয়টা টাকায় খুব বেশিদিন চলতে পারবি না রে মা, তবুও যে কয়টা দিন পারিস ভালো-মন্দ খাস।' হাজারকির চোখ থেকে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রু। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়ায় সে। চাঁদের আলোতে ভেজা চোখ ফেলে বুকভরে দেখে নিজের ছোট্ট বাড়িটা। মায়ের মতোই আপন এই বসতভিটেটুকু। হাজারকির বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। এক সময় মা আর বসতভিটেকে পেছনে ফেলে সে পা বাড়ায় সামনের দিকে।

মধ্যরাতের ঠান্ডা বাতাস ওর চোখ-মুখে স্নেহের পরশ বুলায়। ধীর পায়ে সে এগিয়ে যায় ঘুমটির ঢালু ছেড়ে সমতল জমিনে। শান্ত, স্থির। জমিনের পর জমিন পেরিয়ে এক সময় থামে সে। চারদিকে নীরব-নিথর। চাঁদটার বুকে চেপে বসেছে সুবিশাল এক কালো মেঘ। জ্যোৎস্না মরে আঁধারে ডুবে গেলো পৃথিবী। মধ্যরাতের সিক্ত জমিনে বসে সে তাকায় ফেলে আসা পথের পানে। দেখা যাচ্ছে না নিজের কুঁড়েঘরটা। হু হু করে কেঁদে ফেলে হাজারকি।

পরদিন সকালে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো সংবাদটা, হাজারকি বিষ খেয়েছে! সংবাদটা শোনার পর অনেককেই বলতে শোনা গেলো, ভালোই হয়েছে, মরে গিয়ে নষ্টা মেয়েটা নিজেও বেঁচেছে, সমাজকেও বাঁচিয়েছে। ■

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক জনকণ্ঠের সাহিত্য সাময়িকীতে ১১৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর। পরে তা স্থান পায় মিজান পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের 'সেরা গল্প' গ্রন্থটিতে। ॥

মাহাবুবুল হাসান নীরুর শিশু-কিশোরদের বই

লালপরী, নীলপরীদের দেশে ॥ কিশোরসমগ্র ॥ শ্রেষ্ঠ কিশোর উপন্যাস ॥ ভূতের খামার ॥ মোরগবন্ধু ॥ কুড়িয়ে পাওয়া পুতুল ॥ আকমল মিয়ার কান্ডকারখানা ॥ মঙ্গল যাত্রা ॥ ল্যাঙ্গারিষ্ট গিলটি মামা মানুষ খেকো মিজান স্যার ॥ খেলাধুলার ছেলেবেলা গিলটু মামার জবর খেলা

মেঘগুলো আর পালিয়ে যাবে না

বাতাসে জমিনের বুক পোড়া গন্ধ! সেই গন্ধ আরজ আলীর বুকের ভেতোর মোচড় মারে

গল্প-ছয়

চোখের ওপর হাত রেখে আরজ আলী তাকায় সূর্যের দিকে। চৈত্রের সূর্য; তাই কি চোখ রাখা যায়! গণগণ জ্বলছে। সেকী তেজ! আরজ আলীর দক্ষ কৃষক মন বুঝতে পারে, এবার এই রাক্ষুসে সূর্য সব কিছু গ্রাস করে ফেলবে। সারা চৈত্রে দু'চার ফোঁটা পানির দেখাও পাওয়া যাবে না। বাতাসে জমিনের বুক পোড়া গন্ধ। সেই গন্ধ আরজ আলীর বুকের ভেতোর মোচড় মারে। আরজ আলী জানে, এই গন্ধ দিনে দিনে আরো প্রকট হবে। জলা-জমি সব ফেটে চৌচির হবে। কৃষকের স্বপ্ন পুড়ে আঙরা হবে। হিসেবি কৃষক আরজ আলী অনেক কিছুই আন্দাজ করতে পারে।

এক সময় সে পা পা করে এগিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনে আম গাছের নিচে টঙ্গটার ওপর বসে। ঘাড়ের গামছা দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে ফেলে। সামনে যতোদূর দৃষ্টি যায় জমিন জ্বলছে আগুনে সূর্যের ভয়াল গ্রাসে। মনটা বিষন্ন হয়ে যায় তার। ফসলী জমিগুলোর দুর্দশার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। চাতকের মতো তৃষিত নয়নে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর আরজ আলীদের কী-ইবা করার আছে । আকাশে একটু মেঘের আনাগোনা দেখলেই তারা অধীর প্রতিক্ষায় প্রহর গুণতে শুরু করে, কখন নামবে স্বপ্নের বৃষ্টি। কিন্তু হতাশা ছড়িয়ে এক সময় মেঘগুলো পালিয়ে যায়। হারিয়ে যায়। এ যেনো কৃষককুলের সাথে প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর রসিকতা। ভয়াবহ আশঙ্কাবিদ্ধ হয় কৃষকের স্বপ্ন। বাড়ির ভেতোর থেকে ভেসে আসে স্ত্রী আসমা বানুর কণ্ঠ, 'কই গেলেন। হুনছেন। ভাত বাড়তাছি, গোছল দিয়া আহেন।'

'পোড়া মাটির গন্ধে ভাত আর মুখে রোচেনারে বউ। আইজ মোটে চৈত্রের পনরো দিন যায়; অহনই চৈত্র যেইভাবে ফুঁইসা উঠছে, সামনে আরো দিন তো পইড়া আছে। দাবদাহ শুরু হইছেরে বউ। মাটি ফাইটা চৌচির!'

ক'দিন থেকেই আরজ আলীর নাওয়া-খাওয়ায় মন নেই। এমন দুঃসময়ে সেটা কারই বা থাকে। পেটের ভেতোরটা জ্বলে তাই খায়। স্বাদ-গন্ধ কিচ্ছু বোঝেনা। মনে না টানলে কিসের স্বাদ আর কিসের গন্ধ! মাঝে মাঝে আরজ আলী ভাবে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা না থাকলেই বুঝি ভালো হতো। আজ করুণা ভিক্ষা চাইতে হতো না দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা সূর্যটার কাছে। বৃষ্টির আশায় ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকতে হতো না আকাশের দিকে।

'কিগো, কথা কি কানে গেলো? যান, তাড়াতাড়ি গোছল দিয়া আহেন, বেলা অনেক হইছে।'

গামছায় আর একবার মুখটা মুছে সেটা ঘাড়ে ফেলে টঙ্গ থেকে নেমে দাঁড়ায় আরজ আলী। এরপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় পুকুরের দিকে। পুকুরেও কি আর সেই পানি আছে! শান্তি মতো একটা ডুব দেওয়ারও অবস্থা নেই। হাঁটু ডোবেনা। কি পুকুরের চেহারাটা কি হয়ে গেছে! গত আষাঢ়ে কিছু রুই-কাতলার পোনা ছেড়েছিলো। মাছ তেমন একটা টিকে নাই। আজ-কাল দুনিয়াতে কি আর কারো দিলে রহম আছে। ভেজালে সবকিছু সয়লাব। চৌদ্দআনা পোনাই ছিলো অজাত-কুজাত মাছের। রুই-কাতল যে কয়টা টিকে গিয়েছিলো তা আর তেমন বাড়ে নাই। আর বাড়বেই বা কি করে। ফি বছর পুকুর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলে সে পুকুরে সার, আদার কি আর অবশিষ্ট থাকে! ফাল্গুনের মাঝামাঝি ছমির মাঝিকে ডেকেছিলো। ঝানু মাঝি। পুকুরের পানিতে হাত রেখেই বলে দিতে পারে মাছের অবস্থা। চোর-ছ্যাঁচোরের ভয়ে পুকুরে ফেলে রাখা ঝোপ-জঙ্গল তুলতে তুলতে ছমির মাঝি বলেছিলো, 'কতো পোনা ছাড়ান দিছিলা আরজ ভাই?'

'দ্যাড় কেজি।' উত্তরে বলেছে আরজ আলী।

'পোনাওয়ালা ব্যাটা তোমারে ঠকাইছে। মনে লয়, জাত মাছ তেমুন একটা টিকে নাই। তোমার যেমুন পুকুর, এক কেজি মাছ টিকলেও ঝোপ-ঝাড়ে নাড়া পড়লেই ফালাফালি শুরু করতো।' দুই একটা যা লাফ দিলো তা দেখে ছমির মাঝি বলেছিলো, 'মাছ তো দেহি গায়ে-গতরেও বাড়ে নাই। খাওন-দাওন বুঝি কিছু দাও নাই?

আরজ আলী উত্তর দিয়েছিলো, 'নিজেরাই ঠিক মতো খাবার পাই না, মাছের ভালো-মন্দ সার-আদার যোগামু ক্যামনে! তারপরও যতোটা পারছি এটা ওটা উপড়ি খাবার তো দিছি, কিন্তু তাতে কি আর মাছের গতর বাড়ে! পুকুরের নিজের সেই সার কই! ফি-বছরই তো পুকুর শুকায়া যায়?'

কারেন্ট থাকে না, লোডশেডিং না কি শেডিং! আর যদিও থাকে, তয় ভল্টেজ নাই, তা না হইলে ভল্টেজের আপ-ডাউন!'

'হাছা কথা কইছো আরজ ভাই।' ছমির মাঝি বলেছে, 'কিযে দিন আইলো, নিজেই তো খাইবার পাই না, আইজ তিনদিন হইলো গরুটার জন্যিও খাবার যোগাড় করবার পারতাছি না। ঘাস-বিচালি পুইড়া ছাফা। গরুটার দিকে তাকাইলে মায়া লাগে। চোখে পানি লইয়া কেমুন টুলটুল কইরা আমার দিকে তাকায়া থাকে। বুকটা ভাইঙ্গা যায়।' এরপর ছমির মাঝি বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, 'বুঝলা আরজ ভাই, আমাগো দ্যাশটারে শণির দশায় পাইছে। মানুষজন যেমুন বাটপার হইছে, তেমুন খোদার রহমও উইঠ্যা গেছে। আগের দিনগুলা অহন স্বপ্নের লাহান মনে হয়। ছোডকালে বাজানের লগে যখন জাল টানতাম, মাছে মাছে জাল এক্কেবারে সয়লাব হইয়া যাইতো। মাছেভরা জাল টাইন্যা তোলন কঠিন ঠ্যাকতো; আর অহন পুকুর হেইচ্চাও ডুলা ভরে না। মনে হইলে বুকে কষ্ট লাগে আরজ ভাই!'

আরজ আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেছে, 'গোলার ধান, গোয়ালের গরু আর পুকুরের মাছের দিন তো হেই কবেই শ্যাষ হইয়া গেছে। আগে নিয়ম-শৃঙাখলাডা আছিলো; অহন আর হেইডাও নাই। আসমানের কথাই কও, আর জমিনের কথাই কও, হগলতেই অহন চলে খেয়াল খুশি মতোন, আর আমরা হেগো দিকে তাকায়া হা-পিত্যেস করি। বুঝলা ছমির, নিয়মের যন্ত্রডা হগল জায়গাতেই বিকল হইয়া গ্যাছে।'

সেদিন ছমির মাঝির জালে ধরা পড়েছিলো টাকি-ট্যাংরা সাইজের কুড়ি দেড়েক রুই-কাতলা। মাছ কয়টা দেখে বড়ই কষ্ট পেয়েছিলো আরজ আলী। এক সময় এই পুকুরটাই আট-দশ কেজি ওজনের রুই-কাতলায় সারা বছর ভরা থাকতো।

গোসল তো নয়, হাঁটু পানিতে কোনো রকম ডুব দেয়া। গোটা চারেক ডুব মেরে গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে পুকুরপাড় ছেড়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায় আরজ আলী।
আসমা বানু একটা শুকনো লুঙ্গি স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'দিন কয় বাদে পুসকুনিডাও হুগায়া যাইবো।'
আরজ আলী কোনো কথা বলে না।
দখিন দুয়ারী ঘরের বারান্দায় পাটি পেতে ভাত দিয়েছে আসমা বানু। আরজ আলী কোনো রকমে দু'লোকমা ভাত মুখে দিয়ে উঠে পড়ে।
'কি গো বইলেন আর উঠলেন যে বড়? ' স্বামীকে প্রশ্ন করে আসমা বানু।
'খিদা নাই।'
'কয়দিন থন দ্যাখতাছি খাওন-দাওনে আফনের কেমুন উদাসীন ভাব! কন তো দেহি হইছেডা কি?'
আরজ আলী ঘাড়ের গামছায় মুখ মুছে বলে, 'নারে বউ, কিছু হয় নাই।'
'আমার কাছে লুকান ক্যান?' এবার আসমা বানু স্বামীর চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, 'আফনে কি পারবেন আমার এই চোউখ দুইডারে ফাঁকি দিবার?'
আরজ আলী বারান্দায় রাখা আধভাঙ্গা চেয়ারটাতে বসতে বসতে বলে, 'না, তা পারুম না। পঁচিশ বছরের সংসার জীবনে তা কি কোনোদিন পারছি?' উল্টো আসমা বানুকে প্রশ্ন করে সে।
'হুনেন, আফনের স্বভাব-চরিত্তর আমার কাছে পানির লাহান পরিস্কার। এইবার কন তো দেহি, খাওন-দাওন ছাড়ান দেওনের কারণডা কি?' আসমা বানু নাছোড়বান্দা।
আরজ আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'পোড়া মাটির গন্ধে ভাত আর মুখে রোচেনা রে বউ। আইজ মোটে চৈত্রের পনরো দিন যায়; অহনই চৈত্র যেইভাবে ফুঁইসা উঠছে, সামনে আরো দিন তো পইড়া আছে। দাবদাহ শুরু হইছে রে বউ। মাটি ফাইটা চৌচির!'
আরজ আলী কপাল চাপড়িয়ে বলে, 'এইডা তো আর চৈত্রের রোইদ না, কৃষকের কপালে আগুন।'
আসমা বানু বলে, 'আল্লার ওপর তো কারো হাত নাই।'
স্ত্রীর কথায় ফোঁশ করে ফুঁসে ওঠে আরজ আলী, 'এইডা হইতাছে গিয়া আল্লার গজব। দ্যাশটার উপর আল্লার গজব নামছে। আর নামবোই না বা ক্যান ক, দ্যাশে কি আর অহন ভালা মানুষ আছে! যে যারে পারতাছে ঠকায়া মারতাছে। যাগো ক্ষমতা আছে হেরা

লুইট্টা-পুইট্টা খাইতাছে!' এবার বারুদের মতো জ্বলে উঠে আরজ আলী, 'ঠক-বাটপার, মোনাফেকভরা দ্যাশে আল্লার গজব নামবো না তো কি রহমতের বৃষ্টি হইবো!' একটু থেমে সে বলে, 'তুই চিন্তা কইরা দ্যাখ বউ, কি দ্যাশ কি হইয়া গ্যাছে। আঠারো বিশ টাকা কেজি চাউল, গরীব বাচে কেমুন কইরা! এইবার যদি ইরি-বোরো ধানডা মাইর যায়, তয় আমাগোরে না খাইয়া থাকোন লাগবো।'

আসমা বানু বলে, 'এতো দুর্বল হইয়া পড়েন ক্যান। গরীবের ভরসা তো আল্লা। আল্লা'র উপর ভরসা রাখেন।'

স্ত্রীর কথার পিঠে আর কোনো কথা বলে না আরজ আলী।

'নেন, পান নেন।' আসমা বানু হাতে ধরা পানের খিলিটা স্বামীর দিকে বাড়িয়ে ধরে।

পানটা মুখে পুড়ে আরজ আলী বলে, 'দেও তো দেহি পাঞ্জাবীডা, একটু ঘুইরা আহি।'

'এমুন চান্দিপোড়া রইদ মাথায় নিয়া আবার কই যাইবার চান?'

'যাই দেহি তাহের আলীর লগে আলাপ কইরা কিছু করোন যায় কিনা।'

'আজমত মিয়া যে উচাপাড়ার জমি দুইডায় কারেন্টের পাম দিয়া পানি দিবার চাইলো হেইডার কি হইলো?' স্বামীকে প্রশ্ন করে আসমা বানু।

'আর কইয়ো না, হেইহানেও সমস্যা। কারেন্ট থাকেনা, লোডশেডিং না কি শেডিং! আর যদিও থাকে, তয় ভল্টেজ নাই, তা না হইলে ভল্টেজের আপ-ডাউন!'

তাহের আলী তীব্র ক্ষোভের সাথে বলে, 'শালা, কারেন্টের বাচ্চা কারেন্ট, এইবার আমার লাল বাত্তি জ্বালায়া দিছে। ধার-দেনাগুলাও শোধ দিবার পারুম না।' এক দলা থুথু ছুঁড়ে তিক্ত কণ্ঠে তাহের আলী বলে, 'জুতা মারি নিজের পোড়া কপালডারে।'

আসমা বানু ঠোঁট উল্টে বলে, 'কারেন্টের এত্তো ফ্যাসাং! মগজে কিছু ঢোকে না।'
'আর কইস নারে বউ।' আরজ আলী বলে, 'ম্যালা টাকায় কেনা কতোজনের কতো পাম্প যে নষ্ট হইয়া যাইতাছে হের খবর কে রাখে! অনেক দাম দিয়া মাত্র নয়দিন হইলো আজমত মিয়া শহর থাইক্যা নয়া পাম্প কিইন্যা আনছে, ভল্টেজের আপ-ডাউনে কাইল বিকালে হেইডা জ্বইলা গেছে। গরীবের কি আর কোনোহানে শান্তি আছে। ভাবছিলাম আজমত আলীর পাম খন পানি পাইলে জমি দুইটার জান বাচবো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আরজ আলী বলে, 'উচাপাড়ার জমি দুইটায় যেমুন কইরা ফাটল ধরছে তাতে মনে লয়না এইবার ইরির আবাদ ঘরে উঠবো।' একটু থেমে বলে, 'আজমত আলী তো অহন নিজেই বিপদে আছে, আমারে সাহায্য করবো কি! অহন যাই দেহি তাহের আলীর কাছে, কোনো সাহায্য মেলে কিনা। আমাগো জমি থন খান দুই বাদ দিয়া তো তাহের আলীর জমিও আছে। দেখি লাইন লাগায়া।'
আসমা বানু স্বামীর হাতে পাঞ্জাবিটা তুলে দিয়ে বলে, 'গামছাডা মাথার উপর রাইখেন। যা রোইদ!'
আরজ আলী মাথা কাৎ করে পা বাড়ায়।
তাহের আলী বাড়িতেই আছে। উদোম শরীরে মাটির বারান্দায় একটা মাদুরে শুয়ে সুপোরীর বাকলে তৈরী হাত পাখায় আপন শরীরের উত্তাপ তাড়ানোর চেষ্টা করছে। আরজ আলীকে দেখে উঠে বসে সে। বলে, 'বুঝলা আরজ ভাই, এই পাঙ্খায় গরম যায়না। চৈতের তাপে এক্কবারে সিদ্ধ হইয়া গেলাম। বাপরে, এক্কেবারে হাবিয়া দোজখের তাপ!'
কাঠফাটা রোদ মাথায় বয়ে আরজ আলী একেবারে ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে গেছে। পাখাটা তাহের আলী তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'নেও, চেষ্টা কইরা দেহো, শরীলডা জুড়াইবার পারো কিনা।'
আরজ আলী পাটিতে পা মুড়িয়ে বসে পাখা চালাতে চালাতে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে বলে, 'আগে ভাবী সাবেরে এক গেলাস পানি দিবার কও দেহী। বুকের ভেতোরডা শুকায়া একেবারে কাঠ হইয়া গেছে।'
তাহের আলী চিৎকার করে স্ত্রীকে পানি আনতে বলে আরজ আলীকে প্রশ্ন করে, 'এইবার কও দেহী, এই ভরদুফুরে দোজখের আগুনে পুড়তে পুড়তে আমার বাড়ি আইলা ক্যান?'

পুকুরেও কি আর সেই পানি আছে! শান্তি মতো একটা ডুব দেওয়ারও অবস্থা নেই। হাঁটু ডোবে না। কি পুকুরের চেহারাটা কি হয়ে গেছে!

আরজ আলী বলে, 'পানি চাই, পানি।'
'আরে মিয়া একটু সবুর করো, তোমার ভাবী কুয়া থন তুইলা হীম ঠান্ডা পানি লইয়া আইতাছে। কইলজা একেবারে ঠান্ডা হইয়া যাইবো। বুঝলা আরজ ভাই, আসমান বেরহম হইলেও কুয়াডা অহনো বেরহম হয় নাই।'
তাহের আলীর কথা শুনে আরজ আলী বলে, 'হেইডা তো বুঝলাম। তয় কুয়ার পানিতে ভাবীসাব তো আমার কইলজাডা ঠান্ডা করবো, আর তুমি আমার জমি দুইটার কইলজা ঠান্ডা কইরা দাও তাহের আলী।' একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সে আরো বলে, 'উচাপাড়ার জমি দুইটার দিকে চাওন যাইতাছে না, বুকটা মোচড় দিয়া ওঠে। আহারে, পানির অভাবে জমি দুইটার বুক কেমুন ফাইট্টা ফালা ফালা হইয়া গেছে!' দম নিয়ে সে তাহের আলীকে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা তাহের আলী, তুমি কি জমিনের ভাষা বোঝো?'
তাহের আলী তরমুজের বিচির মতো দাঁতগুলো বের করে হেসে বলে, 'না, হেইডা বোঝনের ক্ষমতা আমার হয় নাই।'
আরজ আলী বলে, 'আমি বুঝি। জানো, কাইল দুফুরে যহন উচাপাড়ার জমি দুইটার কাছে খাড়াইয়া আছিলাম, তখন জমি দুইট্টা আমারে কান্দনের মতো কইরা কইলো, বাপজান, আমরা তো আর পারতাছি না। বড্ড পিয়াস বাপজান! নিজেরা বাঁচবার না

পারলে তোমারে ফসল দিমু ক্যামনে।' আরজ আলী কণ্ঠে আকুতি ঝরে পড়ে, 'তুমি আমার জমি দুইডারে তোমার মেশিনের পানি দিয়া বাঁচাও তাহের আলী।'

আরজ আলীর কথায় তাহের আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে, 'এই দ্যাশের কৃষকগো হেই সুখের দিন আর নাই গো আরজ ভাই। ধার-দেনা কইরা অনেক আশা লইয়া এইবার তিনডা পাম ফিট করছিলাম। নিজের তো আর তেমন জমি-জিরাত নাই; ভাবছিলাম পরের জমিতে পানি দিয়া কয়ডা পয়সার মুখ দেখমু, কিন্তু গরীবের ফাটা কাপল কি আর জোড়া লাগে রে ভাই! ভল্টেজের আপ-ডাউন খাইলো দুইটা পাম। মেশিন দুইটা একেবারে জ্বইলা ছারখার হইয়া গেলো। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাহের আলী বলে, বাকিটা কুনু সময় লো-ভল্টেজ, কুনু সময় হাই, আবার কুনু সময় লোডশেডিং! চালাইবার পারতাছি না।'

আরজ আলী প্রশ্ন করে, 'জ্বইলা যাওয়া মেশিন দুইটারে সারাইবার দাও নাই?'

তাহের আলীর কণ্ঠটা ভারী হলো, 'ম্যালা টাকার ধাক্কা। যাওবা ধার-দেনা কইরা টাকা জোগাড় করলাম, তো মেরামতের দোকানে লম্বা লাইন। নষ্ট মেশিনের যেনো পাহাড় জইমা উঠছে সারনেওয়ালা গো দোকানে। পনরো দিনের আগে মেশিন হাতে পাইবার সম্ভাবনা কম। কওতো মিয়া, তাতে কি ব্যবসা চলে! ভরা মরশুম, পনরো দিন কি কম সময়?' এরপর তাহের আলী তীব্র ক্ষোভের সাথে বলে, 'শালা, কারেন্টের বাচ্চা কারেন্ট, এইবার আমার লাল বাত্তি জ্বালায়া দিছে। ধার-দেনাগুলাও শোধ দিবার পারুম না।' এক দলা থুথু ছুঁড়ে তিক্ত কণ্ঠে তাহের আলী বলে, 'জুতা মারি নিজের পোড়া কপালডারে।'

আরজ আলীও আপন মনে নিজের কপালে জুতা মারতে মারতে তাহের আলীর বাড়ি ছাড়লো। কাছে-কুলে আরো দু'চারজন যাদের মেশিন আছে তাদের কাছেও গেলো সে, কিন্তু সকলের সেই একই কথা, কারেন্টের জন্যি মেশিন চালাইবার পারতাছিনা, নয়তো, মেশিন সারাইবার দিছি।

আরজ আলীর চোখের সামনে ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার হয়ে ওঠে। এর ওর বাড়ি করে করে বেলাটা বেশ পড়ে এসেছে। সূর্যের উত্তাপটা কমে এলেও ভ্যাপসা গরমটা একেবারেই দমেনি। চামড়ায় জ্বলুনি এখনো আছে। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে উচাপাড়ার নিজের জমি দুটোর মাঝ খানের আলের ওপর দাঁড়ায় সে। অশ্রুসজল চোখে একবার ডানে আর একবার বাঁয়ে নিজের জমি দুটোর দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে, 'পারলাম নারে, তগো লাইগা এক ফোটা পানির ব্যবস্থাও করবার পারলাম না।'

আরজ আলীর ভাষা যেনো বুঝলো পোড়া-বিবর্ণ জমি দুটো। হঠাৎ যেনো সে শুনলো জমি দুটো তাকে বলছে, 'বাপজান, যার কেউ নাই তার তো আল্লা আছে। চাইয়া দ্যাহো, আকাশে কেমুন মেঘ জমতাছে, এইবার বৃষ্টি হইবোই।'

আরজ আলী আকাশের দিকে তাকায়। আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে চোখে-মুখে, সত্যিই তো আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে! বাতাসের গন্ধ পাল্টে গেছে। এ গন্ধের সাথে বেশ পরিচিত সে। ভারী বর্ষণ হবে।

বাতাসের গন্ধটা বুকের গভীর পর্যন্ত টেনে নিয়ে সে নিশ্চিত হয়, এবার আর মেঘগুলো পালিয়ে যাবে না।

// গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে ২০০৩ সালে। পরে তা স্থান পায় ২০১০ সাল বিশ্ব সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত লেখকের 'পরবাসে প্রায়শ্চিত্য' গ্রন্থটিতে। //

ম্যাপেল সৌন্দর্যে আত্মাহুতি

লেখক-সাংবাদিক ও বর্তমানে কানাডা প্রবাসী মাহাবুবুল হাসান নীরুর বই 'ম্যাপেল সৌন্দর্যে আত্মাহুতি' প্রবাস জীবনে বসে লেখা। এটি মূলত একটি কলাম গ্রন্থ। লেখক বিগত ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রবাস থেকে প্রকাশিত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল কলাম লিখেছেন তার সবগুলো স্থান পেয়েছে বইটিতে। কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা সমস্যা, সম্ভাবনা, সুখ-দুঃখসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রায় অর্ধশত লেখা বইটিকে করেছে সমৃদ্ধ।

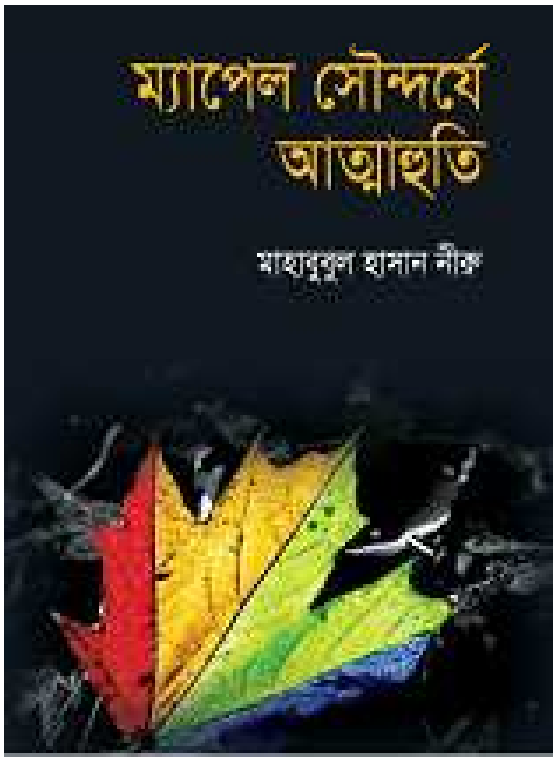

প্রকাশক : বিশ্ব সাহিত্য ভবন।
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০১১।
মূল্য : ১৫০ টাকা।

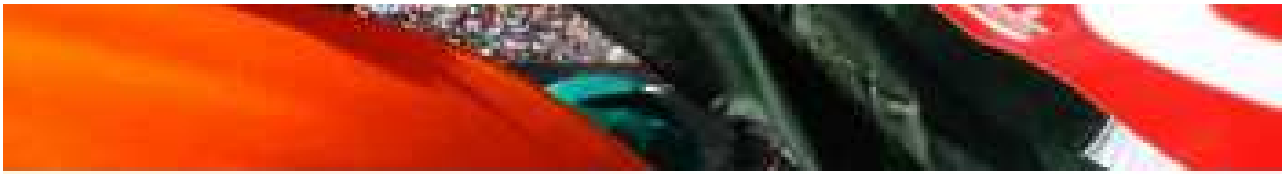

টি কি ট

-ইদানিং জ্যোতিষবিদ্যা টিদ্যা চর্চা-টর্চা করছিস নাকি?

-না, ওসব করি না। অন্যসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারি না; তবে পাক-ভারত ক্রিকেট লড়াইয়ের নির্ভূল ফলাফলটা আগাম বলে দিতে পারি.....

গল্প-সাত

'ঢাকায় পাক-ভারতের মধ্যে ক্রিকেট লড়াই অনুষ্ঠিত হবে'-সংবাদটা আমাদের পরিবারে দারুণ সাড়া তুললো। আমাদের পরিবারটা একটা ক্রিকেট প্রেমিক পরিবার। কি বাবা, কি মা, কি ভাই-বোন সবাই ক্রিকেটের নামে পাগল। না, আমাদের পরিবারে কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড় নেই, তবে বাবার মুখে শুনেছি, কলেজ জীবনে তিনি কলেজ দলের খেলোয়াড় ছিলেন। দাঁড়াতেন উইকেটের পেছনে, অর্থাৎ উইকেট কিপার। কেমন খেলতেন বাবা, কিরন মোরের মতো? হাসি পায় আমার বাবাকে মোরের মতো করে ভাবতে। তবুও কেনো জানি ভাবনা এসে যায়। তবে বাবার মুখে মাঝে মাঝে তার সে খেলোয়াড়ি জীবনের গল্প শুনে মনে হয়, অযথা বাবা ক্রিকেট ছেড়ে ছা-পোষা কেরানী হতে গেলেন। সৈয়দ কিরমানি, কিরন মোরে না হোক-এ দেশের একজন সেরা উইকেট কিপার হলেও তো হতে পারতেন।

ক্রিকেটের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমটা আমাদের পরিবারে বাবাই ছড়িয়েছেন। বাবার মুখে ক্রিকেটের গল্প শুনতে শুনতে আমরা সবাই যে কেমন করে ক্রিকেটের দারুণ প্রেমিক বনে গেলাম তা আজ ভাবতেও বিস্ময় লাগে। অবশ্য আজকের জেনারশনের মাঝে ক্রিকেট একটা নেশা জাগিয়ে তুলেছে। ইমরান, কপিল, আজহার, বোথাম, হ্যাডলি ক্রিকেট বিশ্বের তারকাদের নামগুলো তাদের কাছে নিজেদের নামের মতোই পরিচিত এবং প্রিয়।

আমরা যে ক'জন বান্ধবী একত্রে চলাফেরা করি তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ক্রিকেটের ভক্ত। লিজি তো ক্রিকেট তারকাদের পোষ্টার দিয়ে ওর বেডরুমটা ভরিয়ে রেখেছে। অনেকে আবার প্রিয় তারকার ছবিকে সাথী করেও নিয়েছে। খুকির ভ্যানিটি ব্যাগে সব সময় ইমরান খানের ছবি পাওয়া যাবে। কনিকার বইয়ের ভেতোর পাওয়া যাবে হ্যাডলির ছবি। ক্রিকেট তারকাদের ভিউকার্ড সংগ্রহ করা লুনার প্রধান হবি। বিশ্ব ক্রিকেটের মগজভরা খবরাখবর রাখতে রুনা সদা তৎপর। মনির সাথে কথা বললে মনে হয়, ও যেনো বিশ্ব ক্রিকেটের চলন্ত একটা স্কোরবোর্ড। এই ক্রিকেটকে নিয়ে আমাদের মাঝে দলাদলি, তর্ক-বিতর্ক এমনকি মান-অভিমানের জোয়ার বয়ে যায়। আমি, লিজি আর মনি ভারতের অন্ধ ভক্ত। খুকি, লুনা পাকিস্তান বলতে পাগল। কনিকার প্রিয় তারকা হ্যাডলি হলেও ওয়েষ্ট ইন্ডিজকে সমর্থন করে ও। রুনা অষ্ট্রেলিয়ার সমর্থক। তবে উপমহাদেশের ক্রিকেটে কনিকা ভারতপ্রেমী আর রুনা

পাকিস্তান। আমি নিশ্চিত যে, এতোক্ষণে লুনা, কনিকাদের মাঝে নিউজটা বেশ সাড়া তুলেছে।

পড়ার টেবিলে বসেই নানানটা ভাবছিলাম। এ সময় বাবা অফিস থেকে ফিরলেন। জামা-কাপড় খুলতে খুলতেই, 'রূমকি' 'রূমকি' বলে হাঁক ছাড়লেন। বাবার এটা অভ্যাস।

কোনো শুভ সংবাদ বহন করে আনলে প্রথমেই আমার নামটা ধরে হাঁক ছাড়েন, আর খারাপ কোনো সংবাদ হলে ডাকেন মাকে। বাবার এ ডাকের ধরণ শুনে আমরা পরিবারের সদস্যরা একটা জিনিস বুঝতে পারি, তা হলো, বাবার মন মেজাজ। পরিবারের সদস্য বলতে আমি, দু'ভাই শাহীন ও কবীর আর মা। শাহীন আমার বছর দেড়েকের বড়। ছোট বেলা থেকে ওকে আমার ভাইয়া বলে ডাকতে লজ্জা করে, তাই নাম ধরেই ডাকি। অবশ্য এ ব্যাপারে শাহীনেরও যে প্রশ্রয় নেই তা নয়; শাহীনকে শাহীন বলে ডাকাতে মা মাঝে মাঝে রাগত কণ্ঠে বলেন, রূমকি, দিনে দিনে এতো বড় হলি আজও বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকার অভ্যাসটা তোর গেলো না!

এ সময় শাহীন যদি সামনে থাকে তবে ও মা'র গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে কণ্ঠে বলে, মা, রূমকির মুখে ভাইয়া ডাকটি শুনলে আমার মনে হবে আমি ওর থেকে পাঁচ বছরের বড়। আর তাছাড়া ওর মুখে ঐ ভাইয়া টাইয়া শুনতে আমার একদম ভালো লাগবে না। তারচে' ও আমার নাম ধরেই ডাকুক। ওর মুখে আমার নামটা শুনতে বেশ লাগে।

শাহীন গতবার বিএ পাশ করেছে। আরো লেখাপড়া করার ইচ্ছে ছিলো ওর, কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব অনটন বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো ওর লেখাপড়ায়। বাবা একটি সরকারী অফিসের স্বল্প বেতনের চাকুরে। স্বপ্ন আয়ে তিন সন্তানকে দুর্মূল্যের বাজারে পড়ালেখা করানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে চাকরির ধান্ধায় পথে নামলো শাহীন। ঘুরতে লাগলো অফিসে অফিসে। দেই দেই করে চাকরি দেনেওয়ালারা চাকরি দেন না। হয় হয় করেও হয় না। সরকারী হিসেবের এক কোটি দশ লাখ শিক্ষিত বেকারের মাঝে তাই আজও শাহীন নামটা ঝুলে আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে শোনা যায় দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেড় কোটি। শাহীনের পরে আমি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অনার্স করছি। আমার পরে কবীর। এবার এইচএসসি দেবে।

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় সমস্যা। বন্ধু ছাড়া এদের জীবন চলে না, আবার বন্ধু-বান্ধব থাকলেও সমস্যা বাড়ে।

বাবার ডাক শুনে আমি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাবা গায়ের শার্টটা খুলতে খুলতে বললেন, শুনেছিস, ঢাকায় পাকিস্তান-ভারত ক্রিকেট খেলতে আসছে?

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, হ্যাঁ। শুনেছি।

কোথায় শুনলি?

বাইরে পত্রিকা দেখে এসে কবীর বলেছে। আমি বললাম।

আগে বাসায় আমরা পত্রিকা রাখতাম। এখন আর রাখা হয় না। সংসারের খরচ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। উর্ধ্বগতির বাজারে পত্রিকার দামও বেড়েছে। এ অবস্থায় হকারের বাড়তি বিলটা দেয়া বাবার জন্য খুব কষ্টকর। ভাড়া বাসায় থাকি। বাবার বেতনের অর্ধেকটাই দিতে হয় বাড়িওয়ালাকে, এরপর সংসারের খরচ, সাথে আমার আর কবীরের লেখাপড়ার খরচ দিয়ে বাবার হাতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

লুঙ্গি পরে বাবা খাটে বসতে বসতে বললেন, তোর মা শুনেছে খবরটা?

হ্যাঁ। আমি উত্তর দিলাম।

বুঝলি, এবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে লড়াইটা বেশ জমবে। আরে বুঝলি না, ইমরান আছে যে! ইস, আজহারটা যদি এবার ইমরানকে একটা আখেরি পালিশ করে দিতে পারতো! বাবা ভারত বলতে অজ্ঞান।

এ সময় শাহীন ঘরে ঢুকলো। পাকিস্তানের অন্ধ ভক্ত সে। বাবার কথাগুলো শুনেছে। বাবার সামনের চেয়ারটায় বসতে বসতে সে বললো, না বাবা, আজহার তা কখনোই পারবে না। অধিনায়ক ইমরানের কাছে অধিনায়ক আজহার তো মাসুম বাচ্চা। গলায় অধিনায়কের সাইনবোর্ড ঝুলানো থাকলেও ইমরানের সামনে আজহার কিছুই না। আর সেই কি না পালিশ করবে ইমরানকে! শারজাহ কাপ, নেহেরু কাপে ভারতীয়দের করুণ দশা দেখোনি। আহারে, সে অবস্থার কথা মনে হলেই ওদের জন্য মায়া লাগে।

হয়েছে, হয়েছে। বেশী বকবক করিস না; দেখা যাবে এবার পাকিস্তান ভারতের কি কচুটা করে।

বাবার কথায় শাহীন মুখ টিপে হাসলো। বললো, না বেশী কিছু করবে না; এই হোয়াইট ওয়াশ আর কি। একটু থেমে ও বলে, বাবা, ইমরান এবার যা ফর্মে আছে না! আর যদি ওয়াসিম আকরামটা আসতো তবে তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দশা হতো ভারতীয়দের!

এটা কি তোর ভবিষ্যদ্বাণী? বাবা সরাসরি শাহীনের দিকে তাকালেন।

অবশ্যই, এবং তা একশ' ভাগ সত্যি হবে। দৃঢ় কণ্ঠ শাহীনের।

ইদানিং জ্যোতিষবিদ্যা টিদ্যা চর্চা-টর্চা করছিস নাকি?

না, ওসব করি না। অন্যসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারি না; তবে পাক-ভারত ক্রিকেট লড়াইয়ের নির্ভূল ফলাফলটা আগাম বলে দিতে পারি।

কচু পারিস তুই! বাবা ফুঁসতে লাগলেন।

আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। বললাম, দেখ শাহীন, বেশী চাপা পেটাসনে। '৮৮ সালের এশিয়ান কাপেও তো পাকিস্তান এসেছিলো, কী আন্ডা করেছিলো সেবার? ফাইনালে পর্যন্ত উঠতে পারেনি তারা।

আমার কথায় শাহীনের চামড়ায় হুল ফুটলো। ও ঘা খাওয়া বাঘের মতো বললো, আরে রাখ তোর সেসব পুরনো দিনের বস্তাপচা প্যাচাল!

তবে তুই শারজাহ কাপ ও নেহেরু কাপের কথা তুলছিস কেনো? আমি ঝামটা মেরে বললাম, এই তো গত '৮৯ সালের ডিসেম্বরেও পাকিস্তান ঢাকার এশিয়ান যুব কাপের ফাইনালেও উঠতে পারেনি। বাংলাদেশ থেকে তারা ডাবল গোল্লা নিয়ে দেশে ফিরেছে। মনে আছে সে কথা, নাকি ভুলে গেছিস?

রেখে দে ওসব পুঁচকে টুর্ণামেন্টের কথা। শাহীন হাত নেড়ে বললো, মনে রাখিস,

এবার ইমরান আসছে।
'৮৮'র এশিয়ান কাপে ইমরান আসলে সেবার আর বেংসরকারকে শিরোপা নিয়ে যেতে হতো না।
পাকিস্তান দলে কি ইমরান একাই খেলে নাকি?
আমার কথায় যেনো জোঁকের মুখে নুন পড়লো। আমতা আমতা করে শাহীন বললো, না তা খেলবে কেনো, তবে দলের জয়ের নায়ক তো ইমরানই। ইমরান দলে থাকলেই পাকিস্তান দুর্ধর্ষ আর অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।
বুঝলাম, আর সে জন্যই বুঝি বিশ্বকাপের পর ইমরান অবসর গ্রহণ করলে জিয়াউল হকসহ সবাই তার হাতে-পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো? বলি, ইমরানের ধার যখন কমে বুড়ো বাঘের দশা হবে, ইমরানের সাথে পাকিস্তানও কি তখন ক্রিকেট থেকে অবসর নেবে?
আমার কথায় দু'দিকে মাথা ঝাঁকালো শাহীন, নো নো মাই ডিয়ার সিসটার, আর এক ইমরান তো তৈরী হয়েই আছে; আর সে হচ্ছে, ওয়াসিম আকরাম।
হয়েছে, হয়েছে, আর তর্ক করতে হবে না। বাবা শাহীনের উদ্দেশে বললেন, এখন যা দলের জন্য আল্লাহ আল্লাহ করগে। আর হ্যাঁ শোন, আমি সেলিম সাহেবকে তোর জন্য চেষ্টা করতে বলেছি, যদি পারিস তবে কাল একবার ওর সাথে দেখা করিস।
শাহীন উঠতে উঠতে বললো, বাবা, কতোজনকেই তো বললে। কতোজনই তো তোমাকে আর আমাকে আশ্বাস দিলো, কিন্তু এক বছরে কেউ তো একটা চাকরি দিলো না!
আরে হবে, হবে। হতাশ হচ্ছিস কেনো। বাবা সান্ত্বনার সুরে উপদেশের কণ্ঠে বলেন, দেখিসনি গত বিশ্বকাপের পর অধিনায়কত্ব খুইয়েও কপিল ক্রিকেট ছেড়ে দিলো না। কেনো ছাড়লো না জানিস? কপিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে দেখিয়ে দিতে চায়, তারা ওকে যতোটা অবজ্ঞা করেছে আসলে সে ততোটা অবজ্ঞার পাত্র নয়। আজ কপিল আবার স্ব-মূর্ত্তিতে ফিরে এসেছে। দলের সেরা অলরাউন্ডার! দুর্দান্ত ব্যাটিং, দুর্ষর্ধ বোলিংয়ে প্রতিপক্ষের উইকেট ভাঙ্গা, মাঠময় অসাধারণ ফিল্ডিং! দলে তার সমকক্ষ আর কে আছে? দেখবি, ক'দিন পর কপিল দেবই আবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছে। তবে

আজহারকে আমি খাটো করে দেখছি না। মনের ভেতোর ধৈর্য আর উদ্যম থাকলে সাফল্য না এসে পারে না, কি বলিস?
প্রশ্নটা বাবা যাকে করলেন, সে অনেক আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বাবা তা খেয়ালই করেননি। খেয়াল করে যখন দেখলেন শাহীন তার সামনে নেই, তখন আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ও একটা পাগল।

পরের দিন লিজি, লুনা, রুনা, মনি হৈ চৈ করতে করতে বাসায় এলো। ওরা আসতে পারে এমন একাট ধারণা আমার ছিলো। কারণ, ছাত্র হত্যাকে কেন্দ্র করে উদ্ভট পরিস্থিতির জের হিসেবে ভার্সিটি বন্ধ আছে। কাজেই ভার্সিটিতে দেখা হবার পথও বন্ধ। পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে বাসাতেই আসতে হবে। ওরা এসেই বললো, নে, তৈরি হয়ে নে। কনিকাদের বাসায় যেতে হবে।
মা ওদেরকে চা দিলেন। চা খেতে খেতে লুনা বললো, বুঝলি রুমকি, গতকাল যখন শুনলাম, পাকিস্তান আর ভারত ঢাকায় খেলতে আসছে তখনই আইডিয়িটা মাথায় এলো।
কি আইডিয়া? আমি প্রশ্ন করলাম।
লুনা বললো, এবার আমরা সব বান্ধবী একসাথে মাঠে গিয়ে খেলা দেখবো।
লুনা, রুনা এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে আসতে পারে ভাবিনি। আমার ধারণা ছিলো, সূত্রটা ধরে ওরা একটা পাক-ভারত ক্রিকেট বিতর্কের আসর বসাতে আসতে পারে।

লুনা ঘোষণা করলো, ১৮ মার্চ আমরা প্রথম খেলাটি গ্যালারিতে বসে দেখবো। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা পশ্চিম গ্যালারিতে বসে খেলাটি দেখবো...

রুনা বললো, যদিও বিটিভি ১৮ ও ১৯ তারিখের খেলা দুটো সরাসরি সম্প্রচার করবে; কিন্তু মাঠে বসে সামনা-সামনি প্রিয় দলের প্রিয় খেলোয়াড়দের খেলা দেখার মজাটাই আলাদা।

অফকোর্স! গদগদ কণ্ঠে বললো মনি।

ওদের কথা আমার কানে যাচ্ছে না। আমার মনে তখন অন্য চিন্তার ঝড় বইছে। ওরা সবাই বেশ স্বচ্ছল সংসারের সন্তান। শখ, আহ্লাদে কিছু টাকা ওড়াতে পারে ওরা, যা আমার পক্ষে অনেকটা অসম্ভব। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় সমস্যা। বন্ধু ছাড়া এদের জীবন চলে না, আবার বন্ধু-বান্ধব থাকলেও সমস্যা বাড়ে। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মান-সন্মান বজায় রেখে চলতেও হবে; আবার মান-সন্মান রক্ষা করে চলাটাও দুরূহ ব্যাপার! আসলে আমাদের মতো ঘরের সন্তানদের জীবনটা হচ্ছে সবচে' ক্লাসিক। যাহোক, অবশেষে তৈরী হয়ে ওদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

কনিকাদের বাসায় বসে ফাইনাল ডিসিশান হলো। দলনেতা হিসেবে লুনা ঘোষণা করলো, ১৮ মার্চ অর্থাৎ আগামী পরশু দিন আমরা প্রথম খেলাটি গ্যালারিতে বসে দেখবো। সবার আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে সিদ্ধান্ত হলো, আমরা পশ্চিম গ্যালারিতে বসে খেলাটি দেখবো। লুনা বললো, টিকিট আগেই সংগ্রহ করতে হবে। অতএব কাল সকাল দশটার মধ্যেই সকলে টিকিটের মূল্য বাবদ একশত টাকা করে আমার কাছে কাছে জমা দেবে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভাগ্য ভালো ওরা পাঁচশ' টাকা বা সাতশ' টাকার টিকিটের কথা বলেনি।

লুনা আর রুনা এক নম্বর গেটের টিকিট আড়াই হাজার টাকা দিয়ে কিনতে পারে। সাতশ' বা পাঁচশ' টাকার টিকিট কেনা মনি ও কনিকাদের কাছে কিছুই নয়; তবে সবার কথা ভেবে ওরা একশ' টাকার টিকিট কেনার সিদ্ধান্ত নিলো। যদিও কৌশলগত আঙ্গিকে ব্যাপারটাতে আমার ভূমিকা বেশ জোড়ালো ছিলো। কিন্তু একশ' টাকা জোগাড় করাও যে আমার কাছে বেশ কঠিন, তা বুঝলেও মান-সন্মানের দায়ে সে রিস্কটুকু তো নিতেই হবে। ভার্সিটিতে যাতায়াতের পয়সা থেকে আমি কিছু কিছু করে একটা টিনের কৌটার ভেতোর জমিয়ে থাকি। এতোদিনে ওটাতে হয়তো ত্রিশ চল্লিশ টাকা জমেছে। নিজের হাতে গোটা তিরিশেক আছে, বাকিটা বাবার কাছে চাইতে হবে কিছু একটা কারণ দেখিয়ে। এ পরিবারের কাছে ক্রিকেট খুবই প্রিয়।

নিজের ইচ্ছে দিয়েই আমি বুঝতে পারি, মাঠে গিয়ে খেলা দেখার আগ্রহ কতোটা প্রবল এ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে। তা ছাড়া আমাদের বাসায় টিভিও নেই। আর পরের বাসায় গিয়ে টিভি দেখাটাও বাবা পছন্দ করেন না। এ অবস্থায় প্রতিটি সদস্যের মাঠে গিয়ে খেলা দেখার মতো সামর্থও নেই। কাজেই পরিবারের কারো কাছে নির্লজ্জের মতো নিজের খেলা দেখার কথাটা বলতে আমার বাঁধলো। আমার প্রয়োজন তো গোটা পঞ্চাশেক টাকা। এটা চাইলে বাবা দেবেন।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিলাম। এমন সময় 'রুমকি', 'রুমকি' বলে শাহীন চিৎকার জুড়লো।

আমি শাহীনের ঘরে গিয়ে জানতে চাইলাম, অতো চেঁচাচ্ছিস কেনো?

চেঁচাচ্ছি কি আর সাধে, মহাবিপদে পড়ে!

মহাবিপদ! আমি চোখ বড় বড় করে শাহীনের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মহাবিপদ! এদিকে সেদিক তাকিয়ে শাহীন গলা খাটো করে বললো, তোর কাছে ক'টা টাকা হবে?

কেনো? আমি প্রশ্ন করলাম।

বুঝলি রুমকি, গতকাল যখন শুনলাম, পাকিস্তান আর ভারত ঢাকায় খেলতে আসছে তখনই আইডিয়িটা মাথায় এলো....

আর বলিস না, শাহীন বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললো, বন্ধুর ভাতিজার মুখে ভাতের অনুষ্টান। না গেলেই নয়, অথচ প্রায় শ' সেয়াশ' টাকার ধাক্কা! ফাজিলটা ভাতিজার মুখে ভাত দেয়ার আর সময় পেলো না! গলাটা একটু খাটো করে শাহিন বললো, আমার কাছে অবশ্য কিছু আছে। ভাবলাম, বাবা তো তোকে ভার্সিটিতে যাতায়াত, খাতা-পেন্সিল বাবদ কিছু দেয়, সেখান থেকে তোর হাতে তো কিছু থাকে....

কিন্তু শাহীন, বেশ কিছুদিন থেকে তো ভার্সিটি বন্ধ।

আমার কথায় ও হেসে বললো, আগের জমানো কিছু নেই?

সরি শাহীন, একেবারেই নেই। অন্যদিন হলে এভাবে শাহীনকে 'না' করতাম না। বন্ধুর ভাতিজার মুখে ভাতের অনুষ্ঠানে না গেলে যে ওর ইজ্জতের ক্ষতি হবে, এদিকে হাতের ক'টা টাকা ওকে দিলে বান্ধবীদের কাছে আমারো যে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

শাহীন হতাশ কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে, কি আর করা, ভেবেছিলাম বাবার কাছে চাইবো না। এখন দেখছি বাবার কাছেই চাইতে হবে।

শাহীনের কথা শুনে আমার পিলে চমকে উঠলো, বলে কী! ও যদি বাবার কাছে টাকা চায়, তবে আমি চাইবো কী করে! উহুঃ বন্ধুর ভাতিজার মুখে ভাত অনুষ্ঠানের নিকুচি করি!

কিন্তু এর পরপরই আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, যখন দেখলাম আমার জমানো টাকাসহ টিনের কৌটাটি উধাও! বেশ খোঁজাখুঁজি করেও ওটার যখন কোনো হদিস পেলাম না, তখন আমার মেজাজটা বিগড়ে গেলো। উচ্চ কণ্ঠে 'মা' 'মা' বলে মাকে ডাকতে শুরু করলাম। তবে মা আসার আগেই আমার সামনে এসে দাঁড়ায় কবীর। ওর চোখ-মুখ আর অপরাধীর মতো দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা দেখে আমার মোটেও বুঝতে কষ্ট হলো না যে, অ-কাজটি কবীরই করেছে। উত্তপ্ত কণ্ঠে আক্রমন করলাম ওকে, টাকাসুদ্ধ আমার টিনের কৌটাটা তুই মেরে দিয়েছিস?

হ্যাঁ। অপরাধীর কম্পমান কণ্ঠ কবীরের।

আমি পাথর বনে গেলাম। স্পষ্ট সত্যবাদী ছোট ভাইটির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ; এরপর শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কেনো?

ও আগের মতোই কম্পিত কণ্ঠে বললো, কি করবো আপা, বড্ড বিপদ। পরশু এক বন্ধুর জন্মদিন। দাওয়াত করেছে। এখন যদি না যাই তবে বন্ধুরা ভাববে কিছু একটা গিফট দেয়ার ভয়েই যাইনি।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কবীরকে আদর দিয়ে বললাম, মেরেই যখন দিয়েছিস, তা আর ফেরত দিতে হবে না।

তবে কবীরকে কথাগুলো বলার পর একটা একটা কথা ভেবে বেশ অবাক হলাম, তিনজনেরই সমস্যা কি একই সময়ে হতে হয়! নির্ঘাত ১৮ তারিখ অর্থাৎ আগামীকাল আমাকে অসুখের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। বুঝলাম, খেলা দেখা আমার ভাগ্যে নেই। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেলো।

সে রাতে অফিস থেকে ফিরে বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে একটা মিটিং বসালেন। গলাটা কেশে পরিস্কার করে নিয়ে বাবা বলতে শুরু করলেন, আমি জানি তোরা সকলেই ক্রিকেট খেলা দেখতে আগ্রহী। আমিও তোদের মতোই। ঘরের এতো কাছে প্রিয় দলের বিশ্বখ্যাত সব খেলোয়াড় খেলে যাবে অথচ তাদের খেলা দেখতে পারবো না, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। কিন্তু কি করবো বল, আমি তো তোদের এক হতভাগা পিতা। একটু থেমে বাবা আবার বলতে শুরু করলেন, আমি জানি, আর অন্য দশটা ছেলেমেয়ের মতোই তোদের মনেও সাধ আহ্লাদ আছে, কিন্তু তোরা বাপের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সে সাধ-আহ্লাদ বুকেই চেপে রাখিস। প্রকাশ করিস না কখনো। তোরা আমার লক্ষ্মী সোনামণি। বাবার কণ্ঠটা ধরে এলো। চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বলে চললেন বাবা, মানুষের তো কতোই সাধ-আহ্লাদ থাকে। আমি কোনোদিন তোদের সে আশা পূরণ করতে পারিনি।

বাবার কথায় আমার হৃদয়টা গুমড়ে উঠলো। আমি বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, কে বলেছে ওসব বাবা; তুমি আমাদের যে কষ্ট করে আদর-স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলছো, এমন বাবা ক'জন ছেলে-মেয়ের ভাগ্যে জোটে?

শাহীন উঠতে উঠতে বললো, দূর, এসব শোনার জন্যই বুঝি ডেকেছো!

বাবা নিজেকে সামলে নিয়ে ওকে বাঁধা দিয়ে বললেন, আরে বোস, বোস। উঠছিস কেনো! আসল কথা তো বলাই হয়নি।

মা বাবার উদ্দেশে বললেন, যা বলবে ঝটপট করে বলে ফেলো। চুলোয় তরকারি চাপিয়ে এসেছি।

বাবা যথাসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে বললেন, সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে গেলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে। আজ ম্যানেজার সাহেবকে বলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছি।

কেনো বাবা? আমি প্রশ্ন করলাম।

বাবা আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শার্টের বুক পকেট থেকে পাকিস্তান-ভারতের প্রদর্শনী ম্যাচের পাঁচটি টিকিট বের করে সকলের সামনে মেলে ধরে বললেন, এর জন্য হয়তো আগামী মাসটাতে একটু কষ্ট করতে হবে আমাদের। তা হোক, তবুও তো সবাইকে নিয়ে একটা সাধ মেটাতে পারবো।
আমি দেখলাম কবীরের চোখ দুটো খুশিতে নেচে উঠলো। শাহীনের চোখ দুটোতে আনন্দের প্রকাশ। টাকার জন্য নয়, টিকিটের জন্য নয়, আমরা গোটা পরিবারটা একসাথে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখবো, কথাটা ভাবতেই আমর মনটা খুশিতে নেচে উঠলো। কী এক চরম ভালোলাগার প্রগাঢ় মমতায় চোখ দুটো ভিজে গেলো!

বারান্দার এদিকটায় আবছা অন্ধকার। একা একা দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম আমাদের পরিবারটার সুখের কথা। অভাব আছে, অনটন আছে, তারপরও এতো সুখ ক'টা পরিবারে আছে? এতো উদার আর মহৎ বাবা ক'টা সন্তানের আছে?
এমন সময় চুপি চুপি এসে আমার পাশ ঘেঁষে দাড়ালো কবীর। ওর আচরণে আমি বেশ অবাক হলাম। বললাম, কিরে, কিছু বলবি?
কবীর আমার হাতে একটা টিনের কৌটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, আপা, আমার বন্ধুর জন্মদিনটা বাতিল হয়ে গেছে। এটার আর দরকার হবে না।
আমি হসে বললাম, জন্মদিন আবার বাতিল হয় কী করে!
কোনো কথা বললো না কবীর। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো, ঠিক তেমনই নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করলো। ☐

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইত্তেফাক ভবন থেকে প্রকাশিত তৎকালীন অন্যতম দেশসেরা বিনোদন পত্রিকা সাপ্তাহিক পূর্বানী'র ঈদ সংখ্যায় ১৯৯০ সালে। এরপর ২০০০ সালে বিশ্ব সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত লেখকের 'গল্প সমগ্র' গ্রন্থে তা স্থান পায়। ॥

আমার বিবির বাহারি শখ

বাসর ঘরে ঢোকার আগে টিকলির এক বান্ধবী বলে দিলো, বৌটাকে সাবধানে রেখো, বড্ড অভিমানী। বাবা-মায়ের সাথে অভিমান করে একুশ বছরের জীবনে তেইশ বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো.....

গল্প-আট

না, বিয়েটা আমার ইচ্ছায় হয়নি। এতে আমার মত ছিলো না। কিন্তু অসুস্থ বাবার এক কথা, এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আমার ছেলেবেলার বন্ধু আরিফের মেয়ে। আরিফকে আমি কথা দিয়েছি। বড় গলায় বলেছি, অনল বিদেশ থেকে ফিরলেই তোমার মেয়েকে আমি আমার ছেলের বৌ করে ঘরে তুলবো। এখন যদি তুমি বিয়ে না করো তবে লজ্জায়, অপমানে আমার মরণ ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না।

বাবার কথায় আমি থমকে গেলাম। বাবাকে আমি চিনি। তিনি এক কথার মানুষ। যা বলেন তাই করেন। এমনিতেই তিনি বেশ অসুস্থ। ডাক্তার বলেছেন, সময় ফুরিয়ে এসেছে, একটা দমকা বাতাস এলেই প্রদীপটা নিভে যাবে।

বাবাকে আমি বড় ভালোবাসি। ভীষণ। মরার আগেই লোকটাকে মারতে আমার হৃদয়টা কেঁপে উঠলো। আমার পছন্দের কোনো মেয়ে ছিলো না। সেটা একটা প্লাস পয়েন্ট। লন্ডনে অবশ্য ছেবলি গোছের গোটা কয়েক মেয়ে আংটা লাগানোর পাঁয়তারা করেছিলো। চান্স দেইনি। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান আমি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে লন্ডনে গিয়েছি লেখাপড়া করতে, ছেবলিদের সাথে প্রেম করতে নয়- এ বোধটা আমার মনে সব সময় কাজ করতো। অনেক মেয়ে অনেক ঢংয়ে কথা বলেছে, অনেকভাবে ফাঁদ পেতেছে, কিন্তু ফাঁন্দে পড়ার মতো বগা আমি নই। লিজা নামের একটি মেয়ে তো একবার আমাকে একটা বারো তলা উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদে নিয়ে গিয়ে সোজা-সাপ্টা বললো, এই ছেলে শোনো, আমার সাথে তুমি প্রেম না করলে আমি এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবো।

আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিবিজরিত অনন্তরাম গ্রামের কোনো মেয়ের মুখে এমন কথা শুনলে বোধকরি হৃদয়টা কেঁপে উঠতো, কিন্তু লিজার কথায় আমার হৃদয় একটুও কাঁপলো না, বরং এক ধরনের কৌতুকবোধ করলাম। আমি হাসতে হাসতে বললাম, কষ্ট করে তুমি লাফিয়ে পড়বে কেন, বরং তুমি গিয়ে ছাদের কিনারে দাঁড়াও আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই। জানোই তো আত্মহত্যা মহাপাপ, অন্ততঃ সে মহাপাপ থেকে রক্ষা পাবে।

আমার কথা শুনে ফুঁসে উঠেছিলো লিজা।

ইচ্ছে ছিলো দেশে ফিরে দেখেশুনে মনের মতো একটা মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করবো; কিন্তু আমার সে আশায় গুড়েবালি। বিলেত ফেরত একটা বিদ্বান ছেলে অবশেষে বিয়ে করলাম আমার বাবার নেংটোকালের বন্ধু আরিফ সহেবের একমাত্র কন্যা গুলনাহার খাতুন টিকলিকে। বৌ-এর আমার নামের বাহার আছে বটে, তাই না? শুধু কি তাই, তার বাহারি শখেরও অন্ত নেই! আর সেসব শখ পূরণ করতে আমার রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

বাসর রাতেই টের পেলাম আমি কাকে বিয়ে করেছি। অবশ্য বাসর ঘরে ঢোকার আগে টিকলির এক বান্ধবী বলে দিলো, বৌটাকে সাবধানে রেখো, বড্ড অভিমানী। বাবা-মায়ের সাথে অভিমান করে একুশ বছরের জীবনে তেইশ বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো। পাঁচবার এন্ড্রিন খেয়েছিলো; এগারো বার ঘুমের বড়ি, ছয় বার চড়িয়েছিলো গলায় দড়ি আর একবার খেয়েছিলো কাঁচা গোবর।
-বলো কি! আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম, গোবর খেলে মানুষ মরে নাকি?
- রাগে-অভিমানে তখন ওর কি আর সে হুঁশ ছিলো। ওর তখন একটাই লক্ষ্য ছিলো ও মরবে। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরে, রাস্তার ওপর গোবর দেখে তাই তুলে খেতে শুরু করলো।
-তারপর? চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলাম।
-তারপর আবার কি, সোজা হাসপাতাল।
- ক'বার হাসপাতালে গিয়েছিলো তোমার বান্ধবী?
- প্রতিবার।
-তার মানে তেইশবার!
- জ্বী।
সদ্য বিবাহিত বধূ সম্পর্কে এমন কথা শুনলে কার প্রাণে আর জল থাকে? আমি পানি খেতে চাইলাম। জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটলাম। টিকলির বান্ধবী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমাকে অনেকটা জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো বাসর ঘরে। বাসর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম, ধ্যাৎ, মেয়েটা রসিকতা করেছে, একুশ বছরে কি কেউ তেইশবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাকি! যত্তো সব গুলতানি। আবার বলে কিনা গোবর খেয়েছে, পিতলামির আর জায়গা পায় না!

ঘরের দরজা এঁটে, খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পাঁচ মিনিটের মধ্যে টের পেলাম আমি যাকে বিয়ে করেছি তার ঘন কালো কালো কেশাবৃত মস্তিস্কের অভ্যন্তরে কোনো স্ক্রু নেই!

কিন্তু ঘরের দরজা এঁটে, খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টের পেলাম আমি যাকে বিয়ে করেছি তার ঘন কালো কেশাবৃত মস্তিস্কের অভ্যন্তরে কোনো স্ক্রু নেই!

আমাকে দেখেই আমার নববধূ দাঁত কেলিয়ে হেসে বললো, আমি যে একুশ বছর বয়সে তেইশবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম আমার বান্ধবী সুইটি সে কথা তোমাকে বলেনি?

আমি বিষয়টাকে জোক ভেবে ওর মতো দাঁত কেলিয়ে হেসে বললাম, এই মেয়ে রাখো তো ওসব রসিকতা।

-এই চোপ্, একদম চোপ্! একটি কথাও নয়। টিকলি যেনো উত্তেজনায় ফেটে পড়লো। সে উত্তেজিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলো, আমি রসিকতা করছি সে তোমাকে কে বললো?

-বাপরে, কণ্ঠ তো নয়, একেবারে ফাটা বাঁশ! আমি থমকে গেলাম; এরপর ফস করে পাংচার হয়ে গেলো আমার পৌরুষের চাক্কা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম নববধূ টিকলির মুখের দিকে।

টিকলি বললো, শোনো স্বামী, আমি ভালোর ভালো, মন্দের মন্দ। তুমি যদি আমার সব কথা শোনো তবে আমি কিছুই বলবো না এবং কিছু করবো না। কিন্তু যদি আমার কোনো কথা অমান্য করো তাহলে আমি পটল তুলে তোমাদের গুষ্ঠীশুদ্ধকে জেলের ভাত খাওয়াবো। তোমাকে ফাঁসিতে লটকাবো।

বউয়ের কথা শুনে আমি ঢোক গিললাম। তেষ্টায় বুকের জমিন ফেটে চৌচির হতে লাগলো।

টিকলি লাল বেনারসির নিচ থেকে একটা শিশি বের করে আমার সামনে ধরে বেশ সিরিয়াস কণ্ঠে বললো, এই শিশিটার ভেতোর পাঁচশ' পাওয়ারের পঞ্চাশটা ঘুমের ট্যাবলেট আছে।

আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো।

এরপর টিকলি একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো, যেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে 'আমার মৃত্যুর জন্য আমার স্বামী দায়ী'।

আমি হতভম্ব হয়ে পাথরের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম।

টিকলি ঠোঁটে বক্র হাসি খেলিয়ে বললো, আমাকে বিয়ে করে কাজটা তুমি ভালো করোনি।

আমি কোনো কথা বললাম না।

টিকলি এবার মধুমাখা কণ্ঠে বললো, মেয়েটা আমি মোটেও মন্দ নই, আমার কথা মতো চললেই কোনো সমস্যা হবে না। কি চলবে তো?

আমি বলদের মতো ঘাড় কাত্ করলাম।

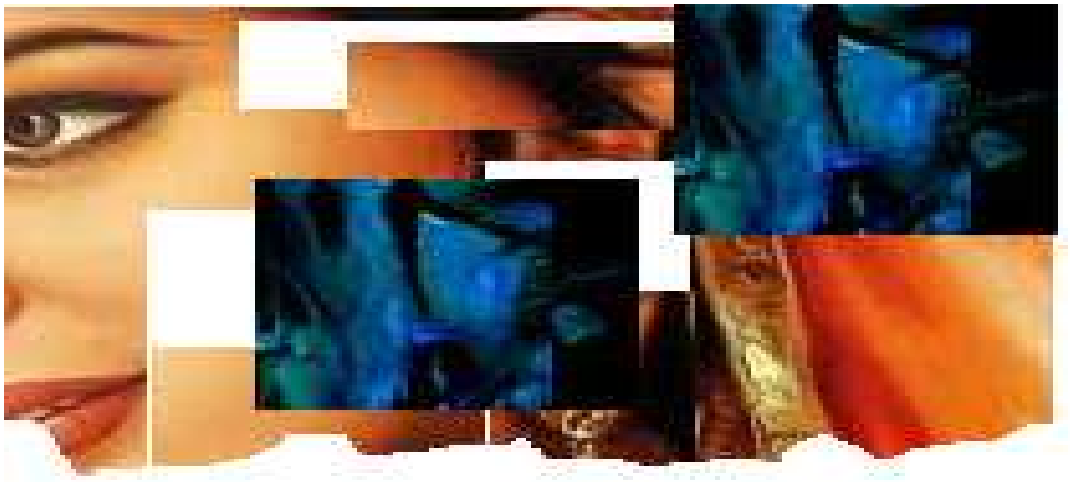

টিকলি একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো, যেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে 'আমার মৃত্যুর জন্য আমার স্বামী দায়ী'।

টিকলি আমার সম্মতিতে বেশ খুশী হলো। চকচক করতে লাগলো ওর চোখ-মুখ। এবং এরপর ও আমাকে যে আদেশ করলো তা শুনে ওর কাছ থেকে ঘুমের বড়িগুলো ছিনিয়ে নিয়ে আমারই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হলো।

সে স্পষ্ট কণ্ঠে আদেশের সুরে বললো, এই মুহূর্তে তোমার গোঁফ চেঁছে ফেলতে হবে। গোঁফওয়ালা মানুষ আমার একদম পছন্দ নয়। আমার কাছে গোঁফ মানেই নাকের নিচে ঠোঁটের ওপর ঘন কালো ঝাড়ুর শলা।

এ তুমি কী বলছো! আমি আমতা আমতা করলাম।

ঠিকই বলছি। টিকলি বললো, তা ছাড়া তুমি যখন আমাকে কিস করবে তখন তোমার ঐ ঝাড়ুর শলার খোঁচা আমাকে সুখ দেবে ভেবেছো? আমার কাছে আসতে হলে তোমাকে ঐ জঙ্গল সাফ করেই আসতে হবে।

বলে কি আমার নববধূ! গোঁফ আমার খুব প্রিয়। লন্ডনের বন্ধুরা বহুবার বলেছে, এ যুগের ছেলেরা গোঁফ রাখে না। গোঁফ ফেলে দে। আমি রাজি হইনি। অবশ্য কোনো কোনো মেয়ে বলেছে, গোঁফে আপনাকে দারুণ লাগে। গোঁফে আমাকে কেমন লাগে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, গোঁফ আমার দারুণ লাগে। আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এ কথা সকলেই জানে। আর তাছাড়া এখন যদি আমি গোঁফ চেঁছেই ফেলি তবে কাল যারা আমাকে দেখবে তারা কি ভাববে! সকলেরই এক প্রশ্ন থাকবে, শখের গোঁফ গেলো কোথায়? আমি কোন্ মুখে তাদের বলবো যে, বৌয়ের শখ পূরণ করতে নিজের শখ এবং সৌন্দর্যকে বিসর্জন দিয়েছি।

কিন্তু টিকলি নাছোড়বান্দা। বললো, বাথরুমে আমি ব্লেড, শেভিং ফোম আনিয়ে রেখেছি যাও গোঁফ চেঁছে এসো, নইলে আমি কিন্তু ঘুমের বড়িগুলো সব খেয়ে ফেলবো।

আমি প্রমাদ গুনলাম, বাপরে, এ তো দেখছি মেয়ে নয়, বজ্জাতের হাড্ডি! পাছে সত্যি সত্যি কিছু একটা ঘটে যায় এই ভয়ে আমি সুরসুর করে বাথরুমে ঢুকলাম। আগের দিনের লোকেরা বলতো, গোঁফের মধ্যেই ফুটে ওঠে পুরুষের পৌরুষ। বৌয়ের হুকুম তামিল করতে পাঁচ মিনিটেই আমি চেঁছে ফেললাম আমার পৌরুষ। আয়নায় গোঁফহীন মুখখানা দেখে আমার ভীষণ কান্না তো পেলোই; সেই সাথে আমি পরিণত হলাম সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষে। নিজেকে নিজেই যেনো চিনতে পারছি না।

এই মুহূর্তে তোমার গোঁফ চেঁছে ফেলতে হবে। গোঁফওয়ালা মানুষ আমার একদম পছন্দ নয়। আমার কাছে গোঁফ মানেই নাকের নিচে ঠোঁটের ওপর ঘন ঝাড়ুর শলা.....

পাক্কা দশ মিনিট নিজের গোঁফ-ছোলা চেহারাটা আয়নায় দেখলাম আর কাঁদলাম এবং মনে মনে গালি-গালাজ করে টিকলির গুষ্ঠী উদ্ধার করলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলাম টিকলি খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই খিকখিক্ করে হেসে উঠে বললো, এখন তোমাকে না দেখতে 'বান্দর বান্দর' লাগছে।

আমি বেশ লজ্জা এবং দুঃখ পেলাম টিকলির কথায়।

টিকলি আমাকে বেশ ভালোভাবে পরখ করে বললো, নাহ্, এখন দেখছি তোমাকে খুব একটা ভালো লাগছে না। একটু থেমে টিকলি কি যেনো ভাবলো তারপর বিজ্ঞের মতো বললো, মনে হচ্ছে ভ্রু-জোরা চেঁছে ফেললে তোমাকে সুন্দর লাগবে।

আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। ঘনকালো ভ্রু আমার। ভ্রু চেঁছে ফেললে আমাকে কেমন লাগবে সে কথা ভাবতে গিয়ে আমি সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। কতোক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম বলতে পারবো না। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম আমার মাথাটা কোলে নিয়ে আমার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টিকলি। ওর চোখের ভাষা দুর্বোধ্য নয়। আমি অসম্ভব রকম চমকে উঠলাম।

টিকলি খিলখিল করে হেসে বললো, বলেছিলাম না দারুণ লাগবে!

-বলে কি মেয়েটা! বুকের ভেতোর মোচড় অনুভব করলাম।

টিকলি আমার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে বললো, দাঁড়াও আয়নাটা আনি। ছুটে গিয়ে টিকলি বাথরুম থেকে আয়না নিয়ে এসে আমার সামনে ধরলো। আয়নায় আমি নিজের যে চেহারাটা দেখলাম তা অবিশ্বাস্যরকম ভয়াবহ! রীতিমতো বিভৎস!

টিকলি তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে বললো, তুমি জ্ঞান হারালে, আমি সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছি। বাথরুম থেকে রেজার এনে তোমার ভ্রু দুটো কামিয়ে দিয়েছি। বেশ ভালো কাজ করেছি, তাই না?

আমার রক্ত মাথায় উঠে গেলো। ইচ্ছে হলো কষে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেই মহিলা ইবলিশটার গালে। আমি কটমট করে তাকালাম টিকলির দিকে।

টিকলি উল্টো ধমকে বলে উঠলো, একটা কথা বলবে তো ঘুমের বড়ি সবগুলো খেয়ে ফেলবো!

কার জীবনে এসেছে এমন বিদঘুটে বাসর রাত! আমি কপাল চাপড়াতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম, কাল সকালে সকলের সামনে এ মুখ দেখাবো কী করে!

ফুলশয্যার রাত নিয়ে মানুষের কত স্বপ্ন থাকে। সাধ থাকে। আমারও ছিলো। ইচ্ছে ছিলো নতুন বৌকে জীবনানন্দের কাব্য শোনাবো। ক'টা কবিতা বেশ কষ্টে মুখস্ত করে নিয়েছিলাম। কিন্তু সব স্বপ্ন, সব সাধ যেনো এক ফুৎকারেই শেষ হয়ে গেলো। বেদনার নোনা জলে ভাসলো আমার জীবনের কাঙ্ক্ষিত ফুলশয্যা।

টিকলি বিছানায় উঠলো এবং বেশ আদুরে কণ্ঠে আমাকে বিছানায় ডাকলো, এই এসো না শুয়ে পড়ি।

আমি কোনো কথা বললাম না, কিংবা নড়লাম চড়লাম না।

ক্ষেপে গেলো টিকলি। চিৎকার করে উঠলো, এই ভোম্বল, কি বলছি, শুনছো না!

আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। ছিয়ানব্বই কেজি ওজন। কিন্তু তাই বলে কেউ কখনো এমন বাজে শব্দ প্রয়োগ করেনি। টিকলির কথায় কষ্ট পেলাম। টিকলি এবার খাট থেকে নেমে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগি কণ্ঠে বললো, তুমি আমার লক্ষ্মী স্বামী, লক্ষ্মী ভোম্বল, লক্ষ্মী বান্দর, লক্ষ্মী পেঁচা, লক্ষ্মী শালিক, লক্ষ্মী টিয়া, লক্ষ্মী কাউয়া। তুমি আমার জানের টুকরা গোবরে পোকা।

হায়রে আমার নববধূ! আমার বৌয়ের আদরের ভাষা শুনে আমি কাঁদবো, নাকি হাসবো!

টিকলি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে খাটে তুলে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললো, পার্লার থেকে সেজে এসেছি, চুমো খেতে পারবে তবে লিপস্টিক নষ্ট হলে কিন্তু কষে একটা চড় দেবো।

চুমো দেবার এমন আজব শর্ত কেউ কি কোনো কালে শুনেছেন?

বধূ আমার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। আমি ভয়ে ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখতে

সাহসী হলাম না। গোঁফ হারিয়েছি, ভ্রু জোড়া হারিয়েছি, এবার নতুন বউয়ের হাতে চড় খেয়ে ইজ্জত খোয়াতে চাই না।
একটু পরই ঘুমিয়ে গেল টিকলি। আমি ওর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকালাম। কেমন শিশুর মতো সহজ-সরল মুখ। এতো রাগ, অপমান, দুঃখ, শোকের পরও কেমন যেনো মায়া ঝরে পড়লো ওর প্রতি। বিয়ের মন্ত্র এভাবেই বুঝি নারী-পুরুষের হৃদয়ে মায়া-মমতার মিনার গড়ে তোলে। আমি ঝুঁকে পড়ে টিকলির গালে আলতো করে একটা চুমো খেলাম।
এরপর দিন পনেরো যে আমার কিভাবে কেটেছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। লোকলজ্জার ভয়ে অসুস্থতার অজুহাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘরের ভেতোর থেকে টিকলির আরও সব আজব আজব শখ পূরণ করে টানা পনের দিন অতিবাহিত করে ষোলদিনের মাথায় গজিয়ে ওঠা গোঁফ ও ভ্রু নিয়ে ঘরের বাইরে পা রাখলাম।

যতোই দিন গড়াতে লাগলো টিকলির বাহারি শখের বহর ততোই বাড়তে লাগলো। সেদিন টিকলি বললো, এই চলো না আজ একটু মার্কেটে যাই।
বৌকে নিয়ে মার্কেটে যাবো, কিছু কেনাকাটা করবো, এতো আনন্দের কথা। অবশ্য যদি পকেট গরম থাকে। আমার পকেটের স্বাস্থ্য খারাপ না। আধা ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে দু'জনে একটা রিকশায় চাপলাম। পথিমধ্যে পড়লো ফকিরাপুলের সুবিস্তৃত ময়লা-আবর্জনার স্তুপ। উহুঃ কি উৎকট দুর্গন্ধ! গা গুলিয়ে ওঠে। নাড়ী-ভুঁড়ি মোচড় খেয়ে বমি ঠেলে এলো। আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম, এই রিকশা জোরে চালাও। কিন্তু টিকলি এ সময় রিকশাওয়ালার উদ্দেশে বলে উঠলো, এই রিকশা এখানে দাঁড়াও তো, বুক ভরে একটু দুর্গন্ধ নেই।
টিকলি বড় শ্বাস নিয়ে বললো, আহ্ কি চমৎকার দুর্গন্ধ! প্রাণটা একেবারে জুড়িয়ে গেলো! এরপর আমার দিকে তাকিয়ে খলবলিয়ে হেসে বলে উঠলো, ঢাকা শহরে এই দুর্গন্ধটাই আমার সব চাইতে ভালো লাগে। বুকভরে তুমিও গন্ধটা নাও। দেখবে বেশ লাগছে। নাও বলছি। ওর কণ্ঠটা কঠিন হলো।
আমি অসহায়ের মতো ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, বমি হয়ে যাবে।
টিকলি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, দু'একবার বমি হতেই পারে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। এক সময় দেখবে বেশ লাগছে। এই দেখো না আমার কেমন ভালো

লাগছে। টিকলি আবারও বুকভরে দুর্গন্ধ নেয়।
এতোক্ষণ মাঝ বয়সী রিকশাওয়ালা কোন কথা বলেনি, এবার সে আমার দিকে তাকিয়ে খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললো, সার, এইহানে বমি করোনে কুনো সমস্যা নাই। আরামসে করেন। ময়লার মইধ্যে ময়লা ফালাইবেন দোষের কি! হে হে হে।
এরপর রিক্সাওয়ালা টিকলির দিকে তাকিয়ে বললো, আফায় বুঝি বস্তিবাসী আছিলেন? আমিও বস্তিবাসী। হের কারণেই তো গন্ধটা আমারও বহুত ভালা লাগে। ডাসবিনের কাছে আইলে আমিও বুক ভইরা শ্বাস লই। ঢাহা শহরে এমন সুগন্ধি তার হয় না গো আফা। কথা শেষ করে রিকশাওয়ালা চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস নেয়।
টিকলি কটমট করে তাকায় রিকশাওয়ালার দিকে, তারপর ঝুঁকে পড়ে চড়াৎ করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে। এরপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আমি কোনোদিনও বস্তিতে ছিলাম না। গন্ধটা আমার এমনিতেই ভালো লাগে। বুঝলি?
নিরীহ, গোবেচারা রিকশাওয়ালা গালে হাত বুলিয়ে বললো, হ আফা, বুঝছি।
সেদিন আর কিছু ঘটালো না টিকলি।
সহিসালামতেই মার্কেটিং করে ফিরলাম।

একদিন টিকলির এক বান্ধবী স্বামীসহ বেড়াতে এলো আমাদের বাসায়। বান্ধবীটি অসম্ভবরকম সুন্দরী। চোখ আটকে যায় ওর ওপর। ড্রইংরুমে আমরা সকলেই বসে গল্প করছি। আমার সুন্দরের পূজারী চোখ দুটো বারবার আটকে যাচ্ছে টিকলির বান্ধবী অপলার মুখের ওপর। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো টিকলি। বার কয়েক আমার দিকে কটমট করে তাকালো। আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঐ যে মানব চরিত্রের বড় দোষ, নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। টিকলির শাসনি দৃষ্টির ফাক-ফোঁকর গ'লে আমার বেয়াড়া চোখ তারপরও খেলে যায় ওর বান্ধবীর মুখের ওপর। টিকলির বুঝি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো, সে উঠে চলে গেলো এবং একটু পরেই ফিরে এলো এক টুকরো কাপড় নিয়ে। কারো দিকে না তাকিয়ে, কারো কোনো কথা কানে না তুলে কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে আমার চোখ দুটো বেঁধে দিলো।
- আহা হা, একী করছো টিকলি! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।
-চোপ্! একটি কথাও নয়, তাহলে সুপার গ্লু দিয়ে কিন্তু চিরজীবনের তরে চোখ দুটো বন্ধ করে দেব।

টিকলির বান্ধবী অপলা খিলখিল করে হেসে বললো, সত্যি টিকলি তুই একটা স্বামী পেয়েছিস বটে। দুনিয়ার সেরা বলদ!

মেহমানদের সামনে একী লজ্জা! সামনে যে বসে আছে আরো একটা পুরুষ মানুষ! এ লজ্জা রাখি কোথায়!

টিকলির বান্ধবী অপলা খিলখিল করে হেসে বললো, সত্যি টিকলি তুই একটা স্বামী পেয়েছিস বটে। দুনিয়ার সেরা বলদ!

চোখ বাঁধা বলে আমি টিকলির মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, অপলার কথা শোনার পর ওর মুখখানা 'বলদ' স্বামী প্রাপ্তির অহঙ্কারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

এরপরও ঘন্টাখানেক চললো ওদের গল্প-গুজোব। ওরা তিনজন অনেক কথা বললো। হাসাহাসি করলো। আমি চুপচাপ থাকলাম। আমার দুঃখের নদী বয়ে যায়।

এক সময় অপলা ওর স্বামীকে নিয়ে বিদায় নিলো। বিদায়ের কালে অপলার স্বামী কাওসার আমার কানে কানে বলে গেলো, আপনে হচ্ছেন পুরুষ জাতির কলঙ্ক।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, বৌয়ের জীবন বাঁচানো ফরজ।

এর দিন সাতেক পরের ঘটনা। অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি আমাদের বেডরুমের খাটে শুয়ে আছে এক হাড্ডিসার বৃদ্ধ। গায়ে শত ছিন্ন লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। সারা শরীরে ধুলোবালি! কে জানে কতোদিন গোসল করে না। গোটা ঘর ভরে গেছে দুর্গন্ধে। বৃদ্ধ আমাকে দেখে হেসে বললো, বাবাজি এসেছেন। বসেন।

বৃদ্ধের সামনের পাটির ওপরে তিনটি, নিচে একটি দাঁত নেই। যখন হাসছে বীভৎস লাগছে। আমি হতভম্ব। কে এই বৃদ্ধ? কি এর পরিচয়?

বৃদ্ধ বুঝি আমার মনের কথা বুঝলো। সে হেসে বললো, আমি এই শহরে ভিক্ষা করে প্যাট চালাই। নাইনটিন ফিফটিতে কেলাস ওয়ানে পড়েছি।

টিকলি ঘরের বাইরে ছিলো। ঘরে প্রবেশ করে বললো, আমার অনেকদিনের শখ ছিলো গো একজন ভিক্ষুককে ঘরে এনে আদর-আত্তি করে খাওয়াবো। নিজেদের বিছানায় শোয়াবো। ওরা কি আর এমন বিছানা চোখে দেখেছে কখনো? এমন খাবার খেয়েছে? আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, ওদের দেননি। মাঝে মাঝে ওদের সাথে শেয়ার করলে ওদের আত্মাটাও শান্তি পাবে; আল্লাহও খুশী হবেন। বুঝলে, আমাদের অনেক ছোয়াব হবে।

আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে টিকলির কথায়। আমি বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, ছোয়াবের খোয়াব তুমি দেখো, আমার দরকার নেই। এরপর বললাম, বিছানায় তো শুইয়েছো! এবার বলো, খানাপিনার কি আয়োজন করেছো?

টিকলি বেশ উৎসাহের সাথে বললো, সাদা পোলাও, খাসির রেজালা, মুরগির রোস্ট, গলদা চিংড়ির ফ্রাই, চাইনিজ ভেজিটেবল, ইলিশ ভাজি, বোরহানী আর সালাদ।

মেন্যু শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। চোখ কপালে তুলে বললাম, এতোসব আয়োজন করলে কখন, কে রাঁধলো এসব?

টিকলি মিটিমিটি হেসে বললো, আমাকে কি তুমি বোকা পেয়েছো! চুপি চুপি দু'দিন থেকেই এসবের আয়োজন করছি। দু'হাজার টাকা দিয়ে হেলপারসহ বাবুর্চি ভাড়া করেছি।

কি করবো আমি! কি বলবো এসব শোনার পর? কষে মনে মনে নিজেকে নিজেই একটা গালি হাঁকালাম, সত্যিই আমি একটা রাম ছাগল।

ঠিক এ সময় বাসার কলিং বেলটা বেজে উঠলো। টিকলি বললো, তুমি দাঁড়াও। আমি দেখছি, কে এলো।

টিকলি বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেলো। একটু পর যখন ফিরে এলো তখন দেখলাম ওর সাথে লাঠিতে ভরকরা কোমড় ঝোলা এক খুনখুনে বুড়িকে। বিস্ময়ে আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেলো।

বিছানায় শোয়া বৃদ্ধ ভিক্ষুক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে দিয়ে আমাকে বললো, বাবাজি, সে আমার বিবি। কমলাপুরে ভিক্ষা করে। আমিই খবর পাঠাইছিলাম।

এবার আমার মাথা ধরে গেলো।

টিকলি এবার বৃদ্ধাকে ধরে খাটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, ওঠেন আম্মা, খাটে উঠে ফকির আব্বার পাশে আরাম করে শোন।

বৃদ্ধ শুয়ে থেকেই বৃদ্ধার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁত কেঁলিয়ে হেসে বললো, আহো গুলবদন, উইঠ্যা আহো। বড়ই নরম বিছনা। বহুত আরাম!

টিকলি ঠেলে তুলে দিলো বৃদ্ধাকে খাটে।

এ দৃশ্য আমি আর সইতে পারলাম না। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। মাথার ভেতোরটা ঝাঁঝাঁ করতে লাগলো।

দিনের পর দিন এভাবে টিকলির আরো যে কতো শখের বলি হতে হলো আমাকে সে সব ঘটনার বর্ণনা ক্ষুদ্র পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমিও তো মানুষ। আমারও তো সহ্যের একটা সীমা আছে।

একদিন টিকলির ব্যাপারে আমি আমার এক ডাক্তার বন্ধু মাখনের শরণাপন্ন হলাম। সব শুনে সে বললো, ভাবী আসলে একজন মানসিক রোগী। মাখন মানসিক রোগেরই ডাক্তার। বললো, সে টিকলির চিকিৎসা করবে। আমি যেনো স্বস্তি পেলাম বন্ধুর কথায়। এর দিন সাতেক পর একদিন বাসায় ফিরে দেখি ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে এক নাপিত বসে আছে। আমি অবাক কণ্ঠে টিকলিকে প্রশ্ন করলাম, নাপিত কেন! কি হবে ওকে দিয়ে?

-তোমার চুল কাটবে। স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলো টিকলি।

-আমার চুল!

- হ্যাঁ।

-আর ক'দিন পর আমি নিজেই সেলুনে গিয়ে চুল কাটাবো।

- না, তুমি এখনই কাটাবে এবং এভাবে কাটাবে। কথাগুলো বলে টিকলি ফুটবলার রোনাল্ডের বিশ্বকাপের সময়কার একটা ছবি আমার সামনে তুলে ধরলো।

পুরো মাথা ন্যাড়া, সামনে কদমছাঁট কিছু চুল। আমি বেশ বিরক্তির সাথে বললাম, শোনো টিকলি, আমি একটি অফিসের পদস্থ কর্মকর্তা। এসব রোনাল্ডো কাট্, গোবিন্দ কাট্ চুল আমার সাজে না। লোকে পাগল বলবে।

টিকলির জেদী কণ্ঠ, আমার এক কথা তুমি এভাবে চুল কাটাবে। আমার বড় শখ। বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর এই চুলের কাটিং দেখে তখনই মনস্থির করে রেখেছিলাম আমার স্বামীর চুল কাটাবো এভাবেই।

টিকলির কথায় আমার দু'কান গরম হয়ে গেলো। ওর সব শখ পূরণ করলেও এ শখটা পূরণে আমার মন মোটেও সায় দিলো না। আমি বেশ রাগত কণ্ঠে বললাম, আমাকে অফিস- আদালতে যেতে হয়। পাঁচজন ভদ্রলোকের সাথে মিশতে হয়। তোমার খেয়াল-খুশী মতো তো আর সব চলতে পারে না।

আমার কথায় বেশ আহত হলো টিকলি। বিয়ের পর এই প্রথম আমার এমন আচরণে বোধকরি হতবাকও হলো সে।

আমি টিকলিকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। ওর এক কথা, তুমি এভাবে চুল না কাটালে আমি আত্মহত্যা করবো।

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো। আমি রাগত কণ্ঠে বললাম, ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। আমি চললাম। আমি হন্ হন্ করে ঘর ছাড়লাম। এরপর বাসা। একবারও পেছন ফিরে তাকালাম না।

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো। আমি রাগত কণ্ঠে বললাম, ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। আমি চললাম। আমি হন্ হন্ করে ঘর ছাড়লাম। এরপর বাসা। একবারও পেছন ফিরে তাকালাম না....

বিকেল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে বাসার পথে পা বাড়ালাম। বুকটা একটা অজানিত আশঙ্কায় কাঁপছে। টিকলির অবাধ্য হওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেও ছিলো না। কিন্তু কে মেনে নেয় ওর এমন বিজাতীয় আবদার? বাসায় ফিরতে ফিরতে সিদ্ধান্ত নিলাম, ঘরে ঢুকেই টিকলিকে জড়িয়ে ধরে আদুরে কণ্ঠে বলবো, এবারের মতো আমাকে মাফ করে দাও। এই যে কান ধরে তিন সত্যি করে বলছি, জীবনে আর কখনো তোমার অবাধ্য হবো না। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। কোজাক, মিস্টার টি যার মতো করে বলো সেভাবেই চুল কাটাবো।

আজ একটা ব্যাপার আমি গভীরভাবে অনুভব করলাম যে, বিয়ের এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি টিকলিকে প্রবলভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। ওর উদ্ভট সব শখ, আবদার দেখে মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে যায় বটে; তবে ওর সান্নিধ্যও কিন্তু দারুণ লাগে। টিকলিও যে আমাকে দারুণ ভালোবাসে সে সত্যটাও উপলব্ধি করি আমি। আমি বিশ্বাস করি, ও মানসিক রোগী না হলে আমাকে কখনোই কোনো বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলতো না। আমার হৃদয়টা ওর সান্নিধ্য পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুকটাও বেশ কাঁপছে। নিজেকে অপরাধী মনে হলো।

বাসার সামনে এসে ভীষণরকম চমকে উঠলাম বারান্দায় আলো জ্বলছে না! কাঁচের জানালা গলে বাসার ভেতরের আলোও দেখা যাচ্ছে না! এবার আমার বুকটা শুকিয়ে গেলো। আমি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে কলিং বেল টিপতে লাগলাম। কিন্তু ভেতোর থেকে কোনো সাড়া নেই! ভীষণ কান্না পেল। কান্নাভরা কণ্ঠে দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে চিৎকার করতে লাগলাম, টিকলি, লক্ষ্মী-সোনা আমার, দরজা খোলো। তারপরও ভেতোর থেকে কোনো সাড়া নেই!! আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা ধাক্কাতে লাগলাম। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করতে থাকলাম। নাহ্, কোনো সাড়া মিলছে না! আমি নিশ্চিত হলাম; রাগে-অভিমানে মেয়েটা সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করেছে। বুক ঠেলে হু হু করে কান্না এলো বটে, তবে একটা কথা মনে পড়তেই ভয়ে-আতঙ্কে সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো, আত্মহত্যা করার আগে নিশ্চয় টিকলি একটা কাগজে লিখে গেছে 'আমার মৃত্যুর জন্য আমার স্বামী দায়ী।' স্ত্রী হত্যার দায়ে আমাকে জেলে যেতে হবে, বিচারে ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে। আমি ভয়ে ভয়ে আশেপাশে তাকালাম, দেখলাম প্রতিবেশীরা অনেকেই ছুটে এসেছে আমার চিৎকার আর দরজায় ধাক্কা-ধাক্কির শব্দে। সকলের মুখে প্রশ্ন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমার স্ত্রী দরজা খুলছে না। এক মুরুব্বী গোছের লোক

আপনারা দেখুন না আশেপাশে কোথাও একটা নাপিত পাওয়া যায় কিনা, আমি রোনাল্ডোর মতো করে চুল কাটাবো। আমার স্ত্রীর বড় শখ ছিলো আমি যেনো রোনাল্ডোর মতো হেয়ারকাট করি।

বললেন, এভাবে চিৎকার-চেচাঁমেচি করার চেয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলুন।
ভেঙ্গে ফেলা হলো দরজা। আমি কম্পিত হাতে ড্রইংরুমের লাইট জ্বালালাম। শূন্য ড্রইংরুম। পা বাড়ালাম বেডরুমের দিকে। পেছনে আমার প্রতিবেশীরা। বেডরুমে ঢুকে লাইট জ্বালাতেই দেখলাম, মেঝের ওপর পড়ে আছে টিকলির আসাড় দেহটা। আমি এবার পাথর বনে গেলাম। এক হাতে তখনো মুঠ করে ধরা ঘুমের ওষুধের শিশিটা, অন্য হাতে এক টুকরো কাগজ। আমি জানি ঐ কাগজটাতে কি লেখা আছে। টিকলিকে হারানোর শোক ছাপিয়ে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করলাম। আমি পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম টিকলির প্রাণহীন দেহটার ওপর। প্রলাপ বকতে বকতে কৌশলে ওর হাতের কাগজের টুকরোটা সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফাঁকি দিতে পারলাম না শিকারী চোখের মুরুব্বী গোছের প্রতিবেশী আহাদ আলীকে। তিনি আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজটা ছিনিয়ে নিতে নিতে বললেন, দেখি, দেখি ওটা কিসের কাগজ। আজকাল স্বামীদের নির্যাতনে স্ত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনা তো আর কম ঘটছে না। আমার চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পুলিশ, থানা, জেল-ফাঁসি-এসব ভেবে প্রচণ্ড রাগ হলো মৃতা টিকলির ওপর। আপন মনে বিড়বিড় করলাম, তুমি মরে গেলে, কিন্তু আমাকে ফাঁসালে কেন!

আহাদ আলী কাগজের বুকের লেখাটা নিজে পড়ে মন্তব্য করলেন, পুলিশ এলে এটা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। পুলিশ নিশ্চিত হতে পারবে আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে।

আমার ধড়ে যেন আর প্রাণ নেই। রীতিমতো কাঁপছি।

আহাদ আলী হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন, পুলিশে খবর দাও। খবরদার, পুলিশ আসার আগে কেউ লাশ ছোঁবে না।

আমি অসহায়ের মতো তাকালাম আহাদ আলীর দিকে। কান্নাভরা কণ্ঠে মিনতি ঝরিয়ে বললাম, বিশ্বাস করুন চাচামিয়া, টিকলি মানসিক রোগী ছিলো। ভাবতেও পারিনি সত্যি সত্যি সে আত্মহত্যা করবে।

আহাদ আলী কোনো কথা না বলে হাতের কাগজের টুকরোটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

আমি কম্পিত হাতে কাগজের টুকরোটা নিয়ে ভেজা চোখের সামনে মেলে ধরলাম এবং অসম্ভবরকম চমকে উঠলাম। কাগজটায় টিকলি লিখেছে, 'আমি জানতাম আমি মানসিক রোগী। মাঝে মাঝে বুঝতাম এ রোগের কারণে আমি আমার স্বামীর প্রতি অনেক অন্যায় আচরণ করি। ভবিষ্যতে যেনো আমার প্রিয় স্বামীর প্রতি আর অন্যায় আচরণ করতে না হয়, সে জন্য নিজের ইচ্ছায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য আমার স্বামীকে যেনো কোনোরকম হয়রানি করা না হয়, কারণ, আমার স্বামীকে আমি ভীষণ ভালোবাসি- ইতি টিকলি।'

চিরকূটটা পড়া শেষ করে আমি টিকলির মুখের দিকে তাকালাম। আমার মনে হলো টিকলি হাসছে। বুকের ভেতোরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। নিজেকে নিজের পশু ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলাম, আপনারা দেখুন না আশেপাশে কোথাও একটা নাপিত পাওয়া যায় কিনা, আমি রোনাল্ডোর মতো করে চুল কাটাবো। আমার স্ত্রীর বড় শখ ছিলো আমি যেনো রোনাল্ডোর মতো হেয়ারকাট করি।

আমার কথা শুনে আহাদ আলী বললেন, বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? ■

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে সাপ্তাহিক বিনোদনের ঈদ সংখ্যায় ॥ পরবর্তিতে তা স্থান পায় মিজান পাবলিশার্স কর্তৃক প্রখাশিত লেখকের 'সোরা গল্প' গ্রন্থটিতে। ॥

'তুমি জানো না বাবা, ইংল্যান্ডের সমর্থকরা সন্ত্রাসী হয়। আর তা ছাড়া তুমি তো এটাও জানো যে, আমি যাকে বিয়ে করবো তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক হতে হবে।'

দলান্তরিত

গল্প-
নয়

পরিবারের সকলে অনেক বুঝিয়েও কানতাকে বিয়েতে রাজি করাতে পারছে না। কানতার এক কথা, এমন একটি ছেলেকে সে বিয়ে করবে যে ছেলেটি ক্রিকেট পছন্দ করে এবং যার একমাত্র পছন্দের দল হতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

বড্ড জেদী মেয়ে। পরিবারের মানুষগুলোও একেবারে দমে নেই। জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে ড্রইংরুমে একটি ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছে কানতা। বেশ পছন্দ হয়েছিলো ছেলেটাকে। হ্যান্ডসাম। শিক্ষা-দীক্ষা ভালো। সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। মোটা বেতনে বড় পদে একটা শিপিং করপোরেশনে চাকুরি করে। ঢাকায় নিজেদের বাড়ি আছে। কথাবার্তাও বলে চমৎকার। নামটাও বেশ। অনল। অনলের সাথে আলাপ করে মন্দ লাগেনি কানতার।

অনলকে যোগাড় করেছেন মিনু খালা। মাকে সাথে করে অনল এসেছে ওকে দেখতে। মিনু খালা বললেন, তোমরা এ যুগের ছেলে-মেয়ে। নিজেরা কথাবার্তা বলো। একে অন্যের কাছে কোনো কিছু জানার থাকলে জেনে নাও।

ড্রইংরুমের সোফায় মুখোমুখি বসলো কানতা ও অনল। কানতা কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি অনলকে প্রশ্ন করলো, আপনি কি ক্রিকেট পছন্দ করেন?

অনল হেসে বললো, শুধু পছন্দই করি না; এক সময় খেলাটা নিজেও খেলতাম।

অনলের উত্তর শুনে খুশী হয় কানতা। ক্রিকেট খেলতো, তার মানে ক্রিকেটের প্রতি প্রবল ভালোবাসা থাকাটাই তো স্বাভাবিক। এবার সে অনলকে প্রশ্ন করে, আপনি কোন্ দলকে সমর্থন করেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাকি অন্য কোনো দল?

অনল উত্তরে যা বললো তা শুনে মেজাজটা বিগড়ে যায় কানতার। বলে কী ছেলেটা, ইংল্যান্ড আবার কারো পছন্দের দল হয় নাকি! তাৎক্ষণাৎ অনলের মুখটাকে কানতার কাছে সিটি করপোরেশনের ডাস্টবিন মনে হলো। কী বলছে এই ছেলে! বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যাদের সমর্থকদের পরিচয় সন্ত্রাসী হিসেবে। যাদের নামের সাথে জড়িয়ে আছে রাজ্যের আতঙ্ক। ফুটবলের কথাই বলা হোক কিংবা ক্রিকেট, প্রতিটি বিশ্বকাপে যাদের ঠেকাতে কর্তৃপক্ষকে আলাদা বাজেট এবং ব্যবস্থা রাখতে হয়; এই ছেলে কিনা তাদেরই সমর্থক! কোনো রাখঢাক না করে কানতা অনলকে সরাসরি এমন একটা প্রশ্ন করে বসে যা শুনে অনল বেশ ধাক্কা অনুভব করে। কানতা জানতে চায়, 'আপনি কি কোনো সন্ত্রাসী?'

'কেনো এ প্রশ্ন করছেন?' ফ্যাকাশে মুখে উল্টো প্রশ্ন অনলের।

অনলকে দলান্তরিত করে ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক বানানো যায় না?’

কানতা বলে, ‘বিশ্বব্যাপী ইংল্যান্ডের সমর্থকদের সন্ত্রাসী বলে একটা বড় পরিচয় আছে; সেটা নিশ্চয় জানেন?’

অনল নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলে, সে আমি জানি; তবে আমি সন্ত্রাসী নই। আর তা ছাড়া ইংল্যান্ডের সব সমর্থকই সন্ত্রাসী এটা ভাবাটা ঠিক নয়।

কানতা এবার প্রশ্ন করে, ইংল্যান্ড দলে আপনার প্রিয় খেলোয়াড় কে?

কালবিলম্ব না করে অনল উত্তর দেয়, ‘বোথাম ও ফ্লিনটফ। তবে বোথামকেই আমার সব চাইতে বেশী পছন্দ’।

‘তিনি তো এখন খেলেন না।’

‘তা খেলেন না, তবে তিনি অনেক বড় মাপের খেলোয়াড় ছিলেন বলেই আজও তাকে আমার বিশেষ পছন্দ।’

‘ওর চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আছে?’

‘না। আমি ওর ক্রিকেটকেই শুধু জানি।

‘ও তো একটা লম্পট।’

‘তা ঠিক জানিনা।’ আমতা আমতা করে অনল।

ফুঁসে ওঠে কানতা, মিথ্যে বললেন। বোথামের লাম্পট্য সম্পর্কে জানেনা, পৃথিবীতে এমন লোক নেই। ইংল্যান্ডে বোধকরি এমন একজন কলগার্ল খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার সাথে বোথামের সম্পর্ক ছিলো না।

কানতার কথায় কোনঠাসা হয়ে পড়ে অনল। মিন মিন করে বলে, 'বলছিলাম ওর খেলা ভালো লাগে.....'

ঝট করে উঠে দাঁড়ায় কানতা। চোখ-মুখ ফেটে বেরুচ্ছে রাগ। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, 'আপনাকে আমার বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

অনল কানতার আচরণে হতভম্ব হয়ে যায়। একজনের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে যা হয়। সে ফ্যালফ্যাল করে কানতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এতে কানতা যেনো আরো জ্বলে ওঠে, তেঁতো গলায় বলে, 'কাউকে পছন্দ করতে হলে তার সব দিক ভালোভাবে জেনে নিতে হয়। ভালো খেলোয়াড় বলে লম্পটদের যারা পছন্দ করে তাদের বিচার-বুদ্ধি নিয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।'

অনলের মুখে কথা সরে না।

কানতা আর কোনো কথা না বলে স্থান ত্যাগ করলো। শরীরের জ্বলুনি এখনো কমছে না। নিজের ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে ।

একটু আগে যা ঘটেছে তার সব কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করে সে। এ সময় ঘরে প্রবেশ করেন কানতার বাবা সেজান রহমান। পাশে বসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি বলেন, 'ছেলেটা সবদিক থেকে ভালো ছিলো রে মা। তোর মিনু খালা সব দেখে-শুনে তবেই ওকে পছন্দ করেছে।'

কানতা লাফ দিয়ে উঠে বসে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'বাবা, ঐ সন্ত্রাসীটার সম্পর্কে তুমি আর একটা কথাও বলবে না।'

'আহ, এসব তুই কী বলছিস, অনল সন্ত্রাসী হতে যাবে কেনো!'

'তুমি জানো না বাবা, ইংল্যান্ডের সমর্থকরা সন্ত্রাসী হয়। আর তা ছাড়া তুমি তো এটাও জানো যে, আমি যাকে বিয়ে করবো তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক হতে হবে।

মেয়ের কথায় রাজ্যের বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে সেজান আহমেদের মন জুড়ে। কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করেন না। কানতা তার একমাত্র মেয়ে। অতি আদরের। অভস্তব জেদি। আর তাই তিনি কথায় বা আচরণে কখোনোই এমন কিছু করেন না, যা কানতাকে কষ্ট দেয়। বরং আদর মাখা কণ্ঠে বলেন, তোরা এ যুগের ছেলে-মেয়ে। তোদের চিন্তা-চেতনা আলাদা; ঠিক আছে, সেটা মানলাম। কিন্তু জীবনসঙ্গী নির্বাচনের প্রধান শর্ত ছেলে বা মেয়েকে হতে হবে একটি ক্রিকেট বা

ফুটবল দলের সমর্থক, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। এটা আমার কাছে অদ্ভূত একটা রোগ মনে হয়।; একটু থেমে সেজান আহমেদ বলেন, 'আমাদের সময় বাবা-মায়েরা তো এসব খেলা খেলতেই দিতেন না। তারা ভাবতেন, এতে ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে, লেখা পড়ার ক্ষতি হবে। এসব খেলার বিরুদ্ধে কতোই না ছিলো তাদের অভিযোগ। আর আজ আমার মতো বাবাদের মেয়ের জন্য খুঁজতে হচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপাড়ের একটি ক্রিকেট দলের এদেশীয় একজন সমর্থক। অর্থাৎ পাত্রের যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে, সে পাত্রীর পছন্দের ক্রিকেট দলের সমর্থক কিনা! আজব সেন্টিমেন্ট!

'অনেক হয়েছে বাবা! বসে বসে আর লেকচার দিও না তো।'

সেজান আহমেদ আর কথা বলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মেয়ের ঘর ছাড়েন। ইতিমধ্যে ডজন খানেক পাত্র দেখা হয়ে গেছে কানতার জন্য। তাদের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে এমনকি কেনিয়ার সমর্থক মিললেও দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক মিলছে না। যদিওবা দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক মিলছে, তাকে আবার নানা কারণে কানতার বাবা সেজান আহমেদ কিংবা ওর মা হোসনে আরার পছন্দ হয় না। হয় ছেলের নাক বোঁচা, নয়তো গায়ের রঙ কালো, কিংবা বেঁটে, নয়তো চাকরিটা ভালো বেতনের নয়।

মেয়ের ঘর থেকে নিজের ঘরে ফিরে সেজান আহমেদ দেখলেন, মুখ কালো করে বসে আছে স্ত্রী হোসনে আরা। পাশে শ্যালিকা মিনু। মেহমানরা বিদায় নিয়েছে। সেজান আহমেদ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বুঝলে কানতার মা, এ কালের ছেলে-মেয়েদের কাছে আজ মা-বাবারা জিম্মি হয়ে পড়েছে। আমাদের সময় আমরা মা-বাবার কথা মেনে চলতাম। এখন আমাদের চলতে হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের কথা মতো। স্বামীর সেসব কথা কানে না তুলে হোসনে আরা বলেন, 'অনল ছেলেটাকে কিন্তু আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

-'তোমার পছন্দ হলে তো আর হচ্ছে না। কানতার পছন্দই আসল কথা।' বিরক্তি ঝরে পড়ে সেজান আহমেদের কণ্ঠে।

'এমন ছেলে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।'

'তুমি কি আমাকে কানতাকে ধরে-বেঁধে ঐ ছেলের সাথে বিয়ে দিতে বলছো?'

'আরে না, তা হবে কেনো। আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি কথা?'

'এই ধরো মানুষ যেমন ধর্মান্তরিত হয়, মুসলমান থেকে খ্রীষ্টান, হিন্দু থেকে মুসলমান হয়, তেমনি অনলকে দলান্তরিত করে ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক বানানো যায় না?'

লাফিয়ে ওঠে মিনু খালা, 'গুড আইডিয়া আপা।'

স্ত্রীর প্রস্তাবটা সেজান আহমেদেরও মনে ধরলো। তবে তিনি বেশ শুস্ক কণ্ঠে স্ত্রীকে বললেন, 'এই দলান্তরের ব্যাপারটা তোমার মেয়ে মেনে নেবে তো?'

'কেনো মেনে নেবে না। কাজি যখন ওদের বিয়ে পড়াবে তার আগে দেশের একজন জাঁদরেল ক্রিকেট বোদ্ধা অনলকে শপথবাক্য পাঠ করিয়ে দলান্তর করার কাজটা সারবেন।'

'কোন্ ক্রিকেট বোদ্ধাকে ডাকবে শুনি?'

'ঐ যে একজন আছেন না, রকিবুল হাসান? এক সময়ের বিখ্যাত ক্রিকেটার।'

'মন্দ বলোনি।' সেজান আহমেদের গদগদ কণ্ঠ।

'শপথবাক্যটা না হয় আমিই লিখে দেবো।' মিনু খালা বলে উঠলো।

'কি লিখবে শুনি?' প্রশ্ন করে সেজান আহমেদ।

উত্তরে মিনু খালা বলে, এই যেমন ধরুন, 'আমি অনল আহমেদ, পিতা আবির আহমেদ,

এই মর্মে শপথ করিতেছি যে, আমি এতোদিন ইংল্যান্ডের সমর্থক ছিলাম, কিন্তু অদ্য উপস্থিত এদেশের একজন প্রখ্যাত ক্রিকেটবোদ্ধা রকিবুল হাসানের সমুখে শপথবাক্য পাঠ করিয়া দলান্তরিত হইয়া আজ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক হইয়া গেলাম। এখন হইতে আমি শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাকেই সমর্থন করিবো, অন্য কোনো দলকে নহে।'

মিনুর কথা শুনে উজ্জ্বল মুখে হোসনে আরা স্বামীকে বলেন, 'আমার বিশ্বাস এই অসুধে কাজ হবে।'

'কিন্তু মিনু, তোমার এ প্রস্তাব অনল মানবে কেনো?' সেজান আহমেদ শ্যালিকাকে প্রশ্ন করেন।

মিনু খালা বেশ আস্থার সাথে বলে, 'আমি জানি সে মানবে। কানতাকে অনলের বেশ পছন্দ হয়েছে। সে আমাকে তার মনের কথা বলেছে। আমার মনে হয়, কানতার জন্য ওর দলান্তরিত হতে আপত্তি থাকবে না।' এরপর মিনু খালা বলে, 'আপা-দুলাভাই, তোমরা কোনো চিন্তা কোরো না তো, অনলের সাথে এ ব্যাপারে আমিই কথা বলবো।'

সেজান আহমেদ আরো একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'দেখো, কতোটা কি করতে পারো। আমার ধারণা, এই ছেলের সাথে বিয়ে হলে কানতা বেশ সুখী হতো। বাকিটা আল্লা'র ইচ্ছে।'

কানতার প্রিয় দল দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন তো দূরের কথা ফাইনালেও উঠতে পারলো না।

সময় নষ্ট না করে সেদিনই মিনু খালা অনলকে দলান্তরিত হওয়ার প্রস্তাবটা দিলো। কানতাকে অনলের সব দিক থেকেই পছন্দ হয়েছে। কানতাকে দেখার পর থেকে ওর কেবলই মনে হচ্ছে, মেয়েটাকে ওর পেতেই হবে, তা সে যেকোনো মূল্যেই হোক। প্রস্তাব শুনে অনল বেশ আবেগের সাথে বললো, 'মিনু খালা, আপনার কাছে বলতে দ্বীধা নেই, কানতাকে দেখার পর থেকেই আমি অন্যরকম হয়ে গেছি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, যে কোনো কিছুর বিনিময়ে ওকে আমার পেতে হবে।' একটু থেমে অনল বলে, 'প্রেমের জন্য কতো রাজাই তো সিংহাসন ছেড়েছেন, কতো জমিদার ছেড়েছেন জমিদারিত্ব আর আমি দলান্তরিত হতে পারবো না? আমি রাজি মিনু খালা। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।'

'গুডবয়', মিনু খালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'তবে একটা কথা খালা।'

'কি কথা?'

ভয়ে ভয়ে বলে অনল, 'ওর যা মেজাজ, এ ব্যাপারে আপনাকেই ওকে ম্যানেজ করতে হবে।'

'সে আমি করবো। তুমি শুধু কাল বিকেলে আমাদের বাসায় একবার আসবে।'

কাঁপা কাঁপা গলায় অনল বলে, 'একটু দেখবেন খালা, আমি যেনো সেফ পজিশনে থাকি। আর একটা কথা, প্লিজ, একটু খেয়াল রাখবেন, ওর হাতের কাছে যেনো আঘাত করার মতো কোনো শক্ত বস্তু না থাকে।'

মিনু খালা মুচকি হেসে বলে, 'প্রেমের জন্য না হয় জীবনটাও দিলে।'

লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘাড় কাৎ করে অনল বলে, 'ঠিক আছে।'

'গর্দভ!'

'আমাকে বললেন?'

'আরে না.....' খিলখিল করে হেসে ওঠে মিনু খালা। আর হাবার মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনল।

'বুক কাঁপে থরথর, নাহি কোনো ভয়-ডর', এই মন্ত্র জপতে জপতে, যেনো গায়ে দুশো ডিগ্রী জ্বর নিয়ে পরদিন বিকেলে কম্পিত পদে কানতাদের বাসায় প্রবেশ করে অনল। ড্রইংরুমে বসার পর থেকেই বার বার ঢোক গিলছে সে। ভয়ে কণ্ঠ শুকিয়ে আসছে। সেদিন মেয়েটার যা মেজাজ দেখেছে তাতে ঢোক না গিলে কী আর উপায় আছে!

আপন মনে ভাবে অনল।
মিনু খালা ওকে বসিয়ে রেখে কানতাকে খবর দিতে গেছে।
মিনিট পাঁচেক পর কানতা ঘরে প্রবেশ করলো। অনল ভয়ে ভয়ে কানতার মুখের দিকে তাকালো। কানতার মুখটা বেশ থমথমে। কোনো ভূমিকা না করে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'ধর্ম যারা ত্যাগ করে তারা নিজের ধর্মের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। দলান্তরিত হওয়াটাও তেমনি। তার মানে কি দাঁড়ালো?'
অবোধের মতো কানতার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে অনল।
কানতা বলে, 'তার মানে আগে ছিলেন সন্ত্রাসী, আর এবার হলেন বিশ্বাসঘাতক। আপনিই বলুন, এমন বিশ্বাসঘাতককে কি বিয়ে করা যায়?'
কেউ যেনো ব্লটিং পেপার দিয়ে অনলের মুখের সব রক্ত শুষে নিলো।
কানতা এবার মুচকি হেসে বললো, 'তবে আমার প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভালোবাসা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আর সেদিকটা বিবেচনা করেই আপনাকে একটা চান্স দিতে চাই।'
নড়েচড়ে বসে অনল। মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
কানতা বলে, 'বলতে পারেন এটা এক ধরনের ভাগ্য পরীক্ষা। কপালে থাকলে আমাদের মিলন হবে।'
তর সইছে না অনলের। সে কম্পিত কণ্ঠে বলে, 'আমি কি জানতে পারি চান্সটার কথা?'
'নিশ্চয়ই', কানতা বলে, 'এবারের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, তবেই আমি আপনাকে বিয়ে করবো।'
কানতার শর্ত শুনে যেনো দমে যায় অনল।
কানতা হেসে বলে, 'এখানে বসে আর সময় নষ্ট না করে বাসায় গিয়ে প্রার্থণায় বসুন। দু'হাত তুলে শুধুই বলতে থাকুন, আল্লাহ, এবার যেনো দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন হয়। তা না হলে যে কানতার সাথে আমার বিয়েটা হবে না।'
বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় কাৎ করে অনল বলে, 'আচ্ছা।'
অনলের আচরণে খিলখিল করে হেসে ওঠে কানতা। হাসতে হাসতেই বলে, 'আর একটি কথা, দলান্তরিতও কিন্তু হতে হবে।'
অনল ঘাড় কাৎ করে বলে, 'আচ্ছা।'
কানতা বলে, 'তা হলে এবার আসুন অনল সাহেব।'

‘আমি এতোদিন ইংল্যান্ডের সমর্থক ছিলাম, কিন্তু অদ্য উপস্থিত এদেশের একজন প্রখ্যাত ক্রিকেটবোদ্ধা রকিবুল হাসানের সমুখে শপথবাক্য পাঠ করিয়া দলান্তরিত হইয়া আজ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক হইয়া গেলাম।আমিন।’

‘জ্বী, আচ্ছা।’ উঠে দাঁড়ায় অনল।

একে একে বিশ্বকাপের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হলো। কানতার প্রিয় দল দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন তো দূরের কথা ফাইনালেও উঠতে পারলো না। বিধ্বস্থ হলো অনলের বুক। অনল কখনো চোখের পানিতে মাটি ভেজায়, কখনো আকাশের পানে চেয়ে কাঁদে। কী এক আজব শর্তের বলি হলো সে! থেকে থেকে পোলক ক্যালিশদের ওপর এতোটাই রাগ ঝরতে থাকলো যে, হাতের কাছে পেলে রীতিমতো পালিশ করে ছেড়ে দিতো। পরিশেষে কানতাকে পাবার আশা পরিত্যাগ করে সে যখন দেবদাস হওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে ঠিক তখনই মিনু খালা বয়ে নিয়ে এলেন এক নীল খাম।

‘কি আছে ওটার ভেতোরে মিনু খালা?’

অনলের প্রশ্নের উত্তরে খিলখিল করে হেসে মিনু খালা বলে, ‘খুলেই দেখো না।’

অনল কম্পিত হাতে খামটা খুলে ফেলে। চোখের সামনে মেলে ধরে নীল পৃষ্ঠার বুকে লেখা ক’টি লাইন, ‘তুমি একটা সুপার ফাইন গর্দভ। শুনলাম, আমাকে না পাবার হতাশায় কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছো। তোমার কান্নার দিন শেষ। এবার আমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহস জোগাবো আগামী বিশ্বকাপ জয়ের জন্য।’

চিঠির ওপর থেকে চোখ তুলে অনল তাকায় মিনু খালার দিকে।

‘কিছু বলবে?’ প্রশ্ন করে মিনু খালা।

ওপর নিচে মাথা দুলিয়ে অনল বলে, ‘মিনু খালা, ওকে একটু বলে দেবেন, বিয়ের পর ও যেনো আমাকে ‘গর্দভ’ না বলে।’

‘ঠিক আছে। বলবো। এবার তুমি বিয়ের জন্য প্রস্তুত হও।’ হেসে বলে মিনু খালা। ■

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে সাপ্তাহিক বিনোদনে। ॥

আদমজী নগরের অতশী

অতশী সরাসরি প্রশ্ন করে, আদমজীর জে ও কলোনীর সেই জীবনটাকে মনে পড়ে?

এক্সকিউজ মি, তুমি অন্তর না? নারী কণ্ঠের প্রশ্ন।

অন্তর চোখ তুলে তাকায়। আটাশ উনত্রিশ বছর বয়সী এক সুন্দরী নারী ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। চেনা মুখ। নিশ্চিত হতে একটু সময় লাগলো। অনেক বদলে গেছে মেয়েটা। রূপ-সৌন্দর্য বেড়েছে; বসন-ভূষণে আমূল পরিবর্তন। যাকে বলে একেবারে ষোলআনা আধুনিকা। ব্লু জিন্সের স্কিন টাইট প্যান্টের সাথে ব্লকের ফতুয়া, একই কাপড়ের ওড়না গলায় পেঁচানো। পায়ে হাই হিল। কাঁধ থেকে নেমে লম্বা ফিতেয় ঝুলছে একটা ছোট সাইজের ভ্যানিটি ব্যাগ। ডাই করা স্টেটকাট চুল। প্লাগ করা চিকন ভ্রু পাখির বাসার মতো বড় বড় চোখ দুটোর সাথে মানিয়েছে বেশ।

হাসছে অতশী। হাসিটা কিন্তু আগের মতোই আছে। এই হাসিটার জন্যই মেয়েটাকে এক সময় খুব ভালো লাগতো অন্তরের। এক সময় যখন একই কলোনীতে ওরা থাকতো তখন কোনো কোনো দিন অতশীকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে রেখে অন্তর বলতো, হাসো তো মেয়ে, তোমার ভুবন মোহিনী হাসিটা। আমার সামনে বসে অনেক সময় ধরে হাসো; শুধুই হাসো।

অন্তরের কথা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তো অতশী। অন্তর প্রাণভরে উপভোগ করতো ওর হাসি। অতশীর সে হাসি একদিন ঠাস বুনুনিতে ভালোবাসার নকশি কাঁথা বিছিয়েছিলো অন্তরের হৃদয়ে। কিন্তু অন্তর যখন জানলো ওরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিজান অতশীকে ভালোবাসে, এবং অতশীও মনের মানুষ হিসেবে বেছে নিয়েছে মিজানকে, সেদিনই সে মনের ভেতোরে সদ্য গড়ে তোলা ভালোবাসার নকশি কাঁথাটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে দীর্ঘশ্বাসের আগুনে। সদ্য উড়াল দেয়া স্বপ্নের বালি হাঁসটার পাখা দুটো দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। বেদনার বালুচরে সেই ডানাভাঙ্গা হাঁসটিকে কবর দিতে মোটেও দেরী করেনি।

তাকে ঘিরে যে অন্তরের ভেতোরে ভালোবাসার একটা মিনার গড়ে উঠছিলো সেটা অতশীও বুঝতে পেরেছিলো । আর তাই একদিন খোলা মনেই এ ব্যাপারে সে অন্তরকে বলেছিলো, তুই আমার ভালো বন্ধু, আর মিজানকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখি। অতশীর কথা শুনে অন্তর মুখে হাসি টেনে বলেছে, মিজান আমার প্রিয় বন্ধু। আমার কাছে ধরা না দিলেও মিজানের কাছে ধরা দিয়েছিস; এতেই আমার আনন্দ। সেদিন ঐ হাসিটুকু দিয়ে অন্তর যে কতো বড় যন্ত্রণাকে বুকের ভেতোরে আড়াল করে গিয়েছে সেটা সে বুঝতে দেয়নি অতশীকে।

অনেকদিন পর অতশীর সাথে দেখা। বছর দশ বারো তো হবেই। বুকের কোথায় যেনো বিদ্যুতের একটা চমক খেলে গেলো।

কেমন আছো অতশী? হেসে প্রশ্ন করে অন্তর।

ভালো। তুমি কেমন আছো?

তা চলে যাচ্ছে।

ভুর ভুর করে দামী পারফিউমের গন্ধ ছড়াচ্ছে অতশীর যৌবনদীপ্ত শরীর।

মুখে হাসি ধরেই অতশী বলে, তুমি কিন্তু একদম বদলাওনি। এক পলকেই চিনে ফেলেছি।

অন্তর হাসতে হাসতে বলে, তবে তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছো অতশী।

মানুষ বেঁচে থাকলে তার রঙ বদলায়। অতশীর পাতলা ঠোঁট হাসি ছড়ায়।

সবার নয়।

এ ক্ষেত্রে নিশ্চয় নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরবে?

হাসে অন্তর। কোনো কথা বলেনা।

অতশী বলে, জীবনটা এমনিতেই ছোট, দিন গত হবার সাথে সাথে তা আরো ছোট হতে থাকে। একদিন বুঝলাম, জীবনের এই স্বল্প সময়টাকে বর্ণহীনভাবে বোতলবন্দী করে রাখার কোনো মানে হয় না। নিজের রঙকে দুনিয়ার জমিনে ছিটিয়ে দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই।

অতশীর কথা শুনে অন্তর হাসে।

এবার অতশী সরাসরি প্রশ্ন করে, আদমজীর জে ও কলোনীর সেই জীবনটাকে মনে পড়ে?

অন্তর অতশীর চোখে চোখ রাখে। কোনো কথা বলে না।

অতশী বেশ দৃঢ়তার সাথে বলে, আমি জানি তুমি সেই জীবনকে ভুলে যেতে পারবে না। কখনোই না।

অন্তর চুলে আঙ্গুল চালিয়ে বলে, তুমি মিথ্যে বলোনি। বেশ উপভোগ্য ছিলো সে জীবন। একেবারে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। আজ ভাবতে বসলে মনে হয়, সত্যিই চমৎকার ছিলো সেই দিনগুলো। বড় ভালো ছিলো কলোনীর সেই মানুষগুলো। কতো পাশের, কতো কাছের ছিলো তারা। সুখ ছিলো, হাসি ছিলো, গান ছিলো।

অন্তরের কথা শুনে অতশী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, আদমজীর সেই সুখী মানুষগুলোর সুখ আজ হারিয়ে গেছে শীতলক্ষ্যার গভীর অতলে। আদমজী জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিবর্ণ-বিভৎস হয়ে গেছে সেখানকার জীবনগুলো। তছনছ হয়ে গেছে অনেক পরিবার। আলোক ঝলমলে জীবনগুলো যেনো একটা দমকা বাতাসে আছড়ে পড়েছে অন্ধকারে। একটু থেমে অতশী বললো, মিনুকে তোমার মনে আছে ? আরে ঐ যে তিপ্পান্ন নম্বর বাসায় থাকতো।

হ্যাঁ। মনে আছে।

দিন পনেরো আগে ওর বাবা আত্মহত্যা করেছেন।

চমকে ওঠে অন্তর, বলো কী! কেনো?

তুমি তো জানোই কেমন আত্মসন্মানবোধ সম্পন্ন ছিলেন সেই আঙ্কেল। হঠাৎ করে চাকরি হারিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। চাকরি হারানোর পর এককালীন যে ক'টা টাকা পেয়েছিলেন তা দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন একটা ছোটখাটো ব্যবসা দাঁড় করানোর। কিন্তু অমন সহজ-সরল, সৎ , আদর্শবান মানুষ কি আর এদেশে এখন ব্যবসা করতে পারে? মাথার ওপর লোকসানের বোঝা, কোমড় সোজা করে দাঁড়াতে না পারার ব্যর্থতা আর সংসারের চেপে বসা অভাব জীবনবিদ্বেষী করে তুললো লোকটাকে। একদিন সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে জীবনের সব জ্বালা জুড়ালেন। একটানা বলে থামলো অতশী।

অন্তর যেনো পাথর বনে গেলো। অনেকটা সময় নীরব থাকলো। কোনো কথা বললো না।

অনেকক্ষণ পরে আরেকটা মর্মস্পর্শী সংবাদ জানাতে নীরবতা ভাঙ্গলো অতশী, আদমজীতে তোমাদের পাশের বাসায় যে বকুল আপা থাকতেন, তিনি গত পরশু মারা গেছেন।

কিভাবে?

হেপাটাইসিস-বি হয়েছিলো।

সুন্দর মনের সদা হাসিমাখা একটা নারীমুখ ভেসে ওঠে অন্তরের মানসপটে। অন্তরদের গোটা বন্ধুমহলের জন্য বকুল আপার আলাদা একটা ভালোবাসা ছিলো। মাঝে মাঝেই ওরা তার বাসায় জম্পেশ আড্ডা বসাতো। আপ্যায়নে কোনো কার্পণ্য ছিলো না বকুল আপার। স্মৃতির বৃক্ষ থেকে একটি প্রিয় ফুল খসে পড়ার সংবাদে ভীষণ কষ্ট পেলো সে। অনেকটা সময় ঝিম মেরে থাকলো। এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো, জানো অতশী, আমার স্মৃতির আঙ্গিনায় যে সুখী-সুন্দর মানুষগুলো হেঁটে বেড়ায়, তাদের কোনো দুঃসংবাদ আমি সহজে মেনে নিতে পারিনা। তাদের দুর্দশাপূর্ণ জীবন আমাকে বড়ই কষ্ট দেয়। একটু থেমে অন্তর বলে, মাস খানেক আগের কথা। একটা বিশেষ প্রয়োজনে সিদ্ধিরগঞ্জ গিয়েছিলাম। ফেরার সময় চিটাগাং রোডে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিক্যাব খুঁজছিলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা হলুদ ট্যাক্সিক্যাব দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় ডাকলাম। একেবারে সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে কাচাপাকা দাড়িওয়ালা বয়স্ক ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, কোথায় যাবেন?

চালকের মুখের ওপর থমকে গেলো আমার চোখ। বড়ই চেনামুখ। দাড়ির জঞ্জাল আড়াল করতে পারলো না এক সময়ের পাশের বাসার আজিজ আঙ্কেলকে। বেদনা ছড়িয়ে পড়লো আমার হৃদয়ময়; চোখে-মুখেও তার প্রকাশ ঘটলো। আমাকে চিনতে পারলেন না আদমজী জুট মিলের এক সময়ের সিনিয়র সুপারভাইজার, আমাদের প্রতিবেশী আজিজ আঙ্কেল। একটা নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে একবার ভাবলাম নিজেকে আড়াল করে ফেলি, কিন্তু বিগত জীবনে তার স্নেহপূর্ণ স্মৃতির প্রগাঢ় অনুভূতি তা হতে দিলো না। আজিজ আঙ্কেল আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। আদমজী জুট মিলের অফিসারদের জন্য সত্তুরটি বাসা নিয়ে নির্মিত জেও কলোনীতে 'ফ্যাশনেবল ম্যান' বলে আজিজ আঙ্কেলের আলাদা একটা পরিচিতি ছিলো। সাহেবী ধাঁচের লাইফস্টাইলে অভ্যস্থ সেই মানুষটি আজ এ কোন্ অবস্থানে? এ কেমন নিয়তির খেলা!

কোথায় যাবেন বাবা?

আজিজ আঙ্কেলের কণ্ঠ আমার হৃদয়কে প্রবলভাবে ক্ষত করলো। তবে আমার পরিচয় পেয়ে তার মাঝে কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। চেহারার কোথাও সঙ্কোচ বা বেদনার কোনো আঁচড়ও চোখে পড়লো না। বরং খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বললেন, নিয়তি আমাকে দশতলা থেকে টেনে গাছতলায় নামিয়ে এনেছে। মেনে নিয়েছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, আমি তবুও তো একটা গাড়ি কিনে চালিয়ে করে খাচ্ছি, কিন্তু আদমজী জুট মিলের অনেক অফিসারই আজ অভাব-অনটনে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে।

আজিজ আঙ্কেল আরো বললেন, জীবনের একটা অসময়ে হঠাৎ করে চাকরি হারানোর সুতীব্র কষাঘাত আদমজীর চাকরিজীবীদের জীবনকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। বোঝোই তো বাবা, জুট মিলে চাকরি করেছি; হাতে করে পেটে খাওয়া ছাড়া তেমন কিছুই করতে পারিনি। হঠাৎ করেই সরকার মিলটা বন্ধ করে দিলো আর আমরা হাজার হাজার মানুষ একেবারে পথে বসে গেলাম। গ্রামে যাদের কিছু সহায়-সম্বল ছিলো তারা গ্রামে ফিরে গেলো, আর অধিকাংশ পরিবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এটা সেটা করার আশা নিয়ে পড়ে থাকলো সিদ্ধিরগঞ্জের আশেপাশে।

আরো একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আজিজ আঙ্কেল বললেন, সরকারের এক ঘোষণায় লাখো জীবনের ওপর যে অভিশাপ নেমে এসেছে তা থেকে অল্পকিছু মানুষ মুক্তি পেলেও, বাকিরা বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

একটানা বলে থামলো অন্তর। এরপর বেশ থমথমে কণ্ঠে বললো- সেদিন আজিজ আঙ্কেলের গাড়িতে চেপেই চিটাগাং রোড থেকে ঢাকায় ফিরেছি। মিটার মাফিক

আদমজী জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিবর্ণ-বিভৎস হয়ে গেছে সেখানকার জীবনগুলো। তছনছ হয়ে গেছে অনেক পরিবার। একটু থেমে অতশী বললো, মিনুকে তোমার মনে আছে ? আরে ঐ যে তিপ্পান্ন নম্বর বাসায় থাকতো।

-হ্যাঁ। মনে আছে।

-দিন পনেরো আগে ওর বাবা আত্মহত্যা করেছেন....

ভাড়াটা দিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠেছিলো। বেশী কিছু দেবার স্পর্ধা দেখাতে পারিনি।
একটা ভারী পরিবেশ চেপে বসলো অন্তর আর অতশীর মাঝে।
অতশী ভারী ভাবটা ঝেরে ফেলতে বললো, চলো কোথাও গিয়ে বসা যাক।
চলো। আপত্তি করলো না অন্তর। হাতে সময় আছে।
শীতমাখা পড়ন্ত বেলা।
অতশী বললো, ওয়েস্টার্ণ গ্রীল-এ গিয়েই বসা যাক। এই শীতের বিকেলে গরম ব্রোস্ট মন্দ লাগবে না। খেতে খেতে জমিয়ে গল্প করা যাবে।
রাস্তা পেড়িয়ে ওরা ওয়েস্টার্ণ গ্রীল-এ প্রবেশ করলো। অতশীর আপত্তি উপেক্ষা করে দুটো ব্রোস্টের বিল মেটালো অন্তর। টোকেন নিয়ে ওরা একটা টেবিলে মুখোমুখি বসলো।
অন্তর মুখভরা হাসি নিয়ে অতশীকে প্রশ্ন করলো, মিজানের খবর কি?
মুহূর্তের মধ্যে অতশীর মুখটাতে রাজ্যের কালো মেঘ যেনো ভর করলো। অন্তর যেনো একটু থমকে গেলো। আদমজী ছেড়ে আসার পর ও জেনেছে মিজান ও অতশী কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেছে এবং এর কিছুদিন পরই মিজান দেশের বাইরে চলে গেছে। এরপর মিজান বা অতশীর আর কোনো খবর জানা ছিলোনা ওর। আজ অতশীকে প্রশ্ন করে এবং ওর মুখভাব লক্ষ্য করে একটা খারাপ কিছু শোনার জন্য প্রস্তত হলো সে।
থমথমে মুখে, ঠান্ডা চোখে অতশী চোখ রাখলো অন্তরের চোখের ওপর। এরপর শান্ত কন্ঠে বললো, বছর খানেক আগে মিজান মেলবোর্ণে রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।
বুকের ভেতোর একটা বড় ধাক্কা অনুভব করলো অন্তর। আর সে ধাক্কটাকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করলো অতশী, আমাদের ব্রোস্ট হয়ে গেছে। চলো নিয়ে আসি।
এখন আর ঐ জিনিস মুখে তুলতে ইচ্ছে করছে না। ব্যথাভরা কন্ঠ অন্তরের।
আহা, মাটি করে দিওনা তো এই চমৎকার সময়টা। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়েই তো মানুষের জীবন। অতশীর কন্ঠ স্বাভাবিক।
তুমি তো জানো অতশী, মিজান আমার কতো কাছের বন্ধু ছিলো।
তুমিও তো জানো, মিজান আমার কতো আপন ছিলো। একটু যেনো ধরে এলো অতশীর কন্ঠ। এরপর মুখে বর্ণহীন একটা হাসি টেনে বললো, মেনে নিয়েছি। মেনে নিতে হয়।
অন্তর বিষন্ন কন্ঠে বললো, আদমজী ছেড়ে চলে আসার পর একদিন শুনলাম তুমি আর মিজান বিয়ে করেছো। এর কিছুদিন পর লেখাপড়া করতে চলে গেলাম ইউরোপে।

সেদিন আজিজ আঙ্কেলের ট্যাক্সিক্যাবে চেপেই চিটাগাং রোড থেকে ঢাকায় ফিরেছি। মিটার মাফিক ভাড়াটা দিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠেছিলো। বেশী কিছু দেবার স্পর্ধা দেখাতে পারিনি।

লেখাপড়া শেষ করে সেখানেই স্বল্প সময়ের জন্য একটা চাকরিতে যোগ দিলাম। প্রবাসেই কাটিয়ে দিলাম আরো ক'টা বছর।

অতশী মুচকি হেসে বলে, নিশ্চয় কোনো বিদেশিনীকে বিয়ে করেছো?

না, আমার স্ত্রী বাংলাদেশী। আমার মতো সেও বাইরে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলো ।

বৌ কি তোমার সাথে এসেছে?

না।

তার মানে?

সে আমার সাথে আসেনি।

কেনো?

ওর এক কথা, আলোর জগত ছেড়ে ও আর অন্ধকারে ফিরতে চায় না। একটু থেমে অন্তর বললো, টুশি আমাকেও আসতে দিতে চায়নি। কিন্তু আমি তো আমার দেশের প্রতি দুর্বল, মাটির প্রতি দায়বদ্ধ। টুশির কোনো বাধাই আমার দেশে ফেরার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি।

অতশী বলে, টুশি তো মিথ্যে বলেনি। সত্যিই তো দেশটা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। দুর্নীতি-সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে। বেকারত্বের ভারে নু'য়ে পড়েছে।

অন্তর বলে, এসব ভেবে আমরা তারুণ্য যদি দেশত্যাগ করি, কিংবা উচ্চশিক্ষা অর্জন শেষে দেশে না ফিরি তবে দেশটা তো পঙ্গু হয়ে যাবে, জাতি হয়ে পড়বে শক্তিহীন।

দেশের জন্য আমাদের করণীয় কি কিছুই নেই? অন্তর আরো বলে, তুমি বা টুশি যেমন করে ভাবো আমি তেমন করে ভাবতে পারিনা। যে মাটির সাথে আমার নাড়ির সম্পর্ক তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে নিজের সুখের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকবো প্রবাসে, তা আমি মেনে নিতে পারিনি। আর তা ছাড়া নিজের দেশের প্রতি আমার মতো তরুণদের একটা কর্তব্য আছে। কেউ কেউ স্বার্থপর হতে পারলেও আমি পারিনি।

অতশী মুচকি হেসে বলে, এমন দেশপ্রেমের মূল্য নিশ্চয় তুমিও একদিন পাবে।

টিটকারী মারছো?

আরে দুর, টিটকারী হবে কেনো। থাক ওসব কথা। এবার বলো, দেশে ফিরে কি করছো?

অন্তর বলে, মাস তিনেক হলো দেশে ফিরেছি, দিন পাঁচেক আগে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছি। ইতিমধ্যে একটা নিয়োগপত্রও হাতে পেয়েছি। পহেলা তারিখে জয়েন করবো। বলতে পারো সেই অর্থে এখনো বেকার।

চাকরিটা কি?

একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে, এসিস্টেন্ট ম্যানেজার। বড় কোম্পানী, হ্যান্ডসাম স্যালারী, কাজেই অর্থকষ্টে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কথাটা ঠিক বললে না। এ দেশে সবখানেই, সবকিছুতেই প্রবল ঝুঁকি, যাকে বলে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা।

কোথায়ই বা ঝুঁকি নেই? বিদেশও কি ঝুঁকি কম? সে যা হোক, রাখো তো এসব প্যাচাল। তুমি বোস আসি খাবার নিয়ে আসছি। কথাগুলো বলতে বলতে অন্তর উঠে দাঁড়ালো।

আমিও তোমার সাথে আসছি। ট্রে তো দুটো। অতশীও উঠে দাঁড়ালো। কাউন্টার থেকে ওরা খাবারের ট্রে নিয়ে এসে আবার মুখোমুখি বসলো। আগুনের ওপর থেকে সদ্য নামিয়ে আনা তীব্র গরম ব্রোস্ট। হাত দিয়ে ছিড়তে গিয়ে ছ্যাঁকা খেলো অতশী, উহু বাপরে! ছ্যাঁকা খাওয়া আঙ্গুল দুটো ঠোঁটের ওপর রেখে জ্বালা প্রশমনের চেষ্টা করতে লাগলো।

অন্তর বললো, তুমিও কি বিদেশ-টিদেশ যাবার ধান্ধা করছো নাকি?
অতশী একটু মাংস ছিঁড়ে মুখে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললো, তেমন চিন্তা-ভাবনাই তো ছিলো। এরপর মুচকি হেসে সে বলে, তবে এখন তোমার সাথে দেখা হবার পর ভাবছি অন্য কথা।
কি কথা?
কথাটা তোমাকে ঠিক এখনই বলতে চাচ্ছিনে। আচ্ছা অন্তর, তোমার বৌয়ের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন ছিলো?
উত্তরে অন্তর বলে, মন্দ ছিলো না। তবে এখন এ দেশে আসার পর মনে হচ্ছে টুশির জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।
কি করে বুঝলে?
ও টেলিফোনে তেমন কথাই জানিয়ে দিয়েছে। সাফ সাফ বলে দিয়েছে, আমি যদি আবার বিদেশে ফিরে যাই তবেই সম্পর্ক থাকবে, নতুবা নয়। কিন্তু আমার পক্ষে তা তো আর সম্ভব নয়।
অন্তরের কথায় অতশীর চোখে-মুখে যেনো আনন্দের ছটা ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়ালো না ওর। ও জানে এখন অতশী কি ভাবছে। ও প্রথমে অতশীর অর্ধভুক্ত ব্রোস্টের দিকে তাকালো, পরে অতশীর মুখের দিকে। এরপর অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে, অতশী, ভেবো না আমি তোমাকে এখনো ভালোবাসি।

॥ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে ২০০৩ সালে। ॥

কো ল কা তা থে কে দি ল্লী

গ্রন্থটি মূলতঃ ভ্রমণকাহিনী হলেও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে কোলকাতা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-ঐতিহ্য। তুলে ধরা হয়েছে দিল্লীতে খাবার-দাবার ও কেনাকাটার নানা তথ্য।

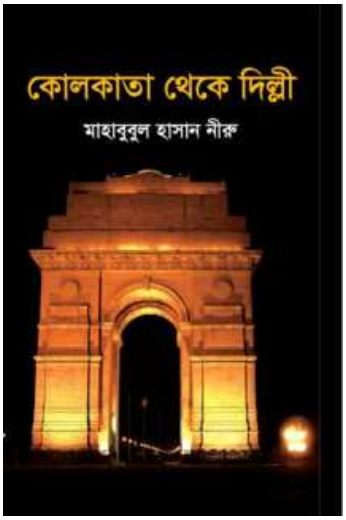

প্রকাশক: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, মূল্য: একশ' টাকা

মাহাবুবুল হাসান নীরু। সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক। জন্ম ১৯৬৫ সালের পহেলা জুন রংপুরের পীরগাছা থানার অনন্তরাম গ্রামে। কৈশোরের শুরুতেই ফুটবলের সাথে গড়ে ওঠে তার সুনিবিড় সম্পর্ক। ফুটবলের মাঠে প্রায় এক যুগ গত করে এক সময় ধীরে ধীরে তার প্রবেশ ঘটে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে। পরবর্তীতে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকেই বেছে নেন। '৯০-এ যোগ দেন ইত্তেফাক ভবন থেকে প্রকাশিত দেশসেরা 'সাপ্তাহিক রোববার' পত্রিকায়। প্রথমে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিলেও পরে তিনি পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একাধারে এ দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময়। রোববারের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৯২ সালে তিনি প্রকাশক এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে রোববার পাবলিকেশন্সের নতুন ক্রীড়া পত্রিকা পাক্ষিক ক্রীড়ালোক প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে যে পত্রিকাটি রচনা করে দেশের পত্রিকা জগতে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। ২০০৭ সালের গোড়া থেকে ২০০৮ সালের জুন পর্যন্ত রোববার ও ক্রীড়ালোকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি দৈনিক ইত্তফাকের এই নগরী, ক্রীড়াঙ্গন, রিয়েল এস্টেট, রূপসি চট্টগ্রাম, কাঞ্চনকণ্যা সিলেট বিভাগগুলোর বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রিন্ট মিডিয়া ছাড়া ইলেকট্রোনিক মিডিয়াতেও রয়েছে তার পদচারণা। নির্মাণ করেছেন নাটক ও টক-শো। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শাখায় লেখালেখিও করেছেন প্রচুর। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৭। স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন বেশ ক'টি পুরস্কার। ২০০৮ সালে জুন মাসে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে কানাডায় পাড়ি জমান। বর্তমানে কানাডার ক্যুইবেক প্রদেশের মন্ট্রিয়লে অবস্থান করছেন।

শৈলী প্রকাশনী বাছাই করেছে সেরা দশ, আর এ দশটির মধ্য থেকে একটি ‘সেরা গল্প’ বাছাই করে আপনি জিতে নিতে পারেন দশ হাজার টাকা!

TAILOR & DRY CLEANERS HUM, Montreal

এ র সৌ জ ন্যে জি তে নি ন

দশ হাজার টাকা!

মাহাবুবুল হাসান নীরুর বিভিন্ন গল্পগ্রন্থ থেকে শৈলী প্রকাশনী সব ধরণের পাঠকের কথা মাথায় রেখে বাছাই করেছে ‘সেরা দশ গল্প’। যা এ গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এ দশটি গল্প থেকে আপনি বাছাই করুন একটি সেরা গল্প, এবং গল্পটির নাম ও আপনার পূর্ণ ঠিকানা, ই-মেইল, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে)সহ ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ripon4t@ gmail.com – এ মেইল করুন।

‘সেরা’ হিসেবে যে গল্পটির পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের রায় যাবে সেখান থেকে মন্ট্রিয়লের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে একজন বিজয়ীকে। ডাক যোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে বিজয়ীর পুস্কারের অর্থ।

TAILOR & DRY CLEANERS HUM,
125 Ave. Mont Royal Est
Montreal, Quebec, H2T IN9
Tel: 514 845 5893

কানাডা থেকে খুব শিগগিরই আত্মপ্রকাশ করছে ভিন্ন ধারার একটি পারিবারিক ই-পত্রিকা

সময়ের কথা

স ম য়ে র স্রো তে ব ন্ধু স বা র

বাঙ্গালি কমিউনিটির হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার চিত্র তুলে ধরার অভিপ্রায় নিয়ে প্রকাশিতব্য পত্রিকাটিতে থাকবে রিপোর্ট, নানামুখি প্রতিবেদন, ফিচার, সাক্ষাৎকার, ভ্রমণ, লাইফ স্টাইল, চিকিৎসা, খেলাধুলা, রাশি, রান্নাবান্নাসহ বাংলাদেশ ও প্রবাসের জীবন ঘনিষ্ঠ সব বিষয়। লিখবেন বাংলাদেশ ও প্রবাসের নবীন-প্রবীণ লেখক-সাংবাদিকরা.....

সময়ের কথা

সময়ের স্রোতে বন্ধু সবার

স র্বা ধু নি ক প্র যু ক্তি স মৃ দ্ধ এ ক টি অ ন লা ই ন প ত্রি কা

-- একটি শৈলী প্রকাশনা --

বইটি ডাউনলোড করুন: http://shoily.com/sg.pdf

বইটি অনলাইনে পড়ুন: http://shoily.com/sg/

নভেম্বর, ২০১২

প্র কা শ নী

http://shoily.com